সিদ্দীকশ্রেষ্ঠ

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

সিদ্দিকশ্রেষ্ঠ

সিদ্দিকশ্রেষ্ঠ

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

সিদ্দিকশ্রেষ্ঠ

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ
ফোনঃ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১৬৭৭০৪২৮৯২, ০১১৯০৭৪৭৪০৭

প্রচ্ছদ ঃ সাবৃণা

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০১৩ ইং

মুদ্রকঃ শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১২৬৮৮৭, ০১৭১৫৩০২৭৩১

পরিবেশক
মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০
মোবাইলঃ ০১১৯৯-৪৩৫৭৩৮, ০১৯২৯-৪৮৫২৯৯

হাদিয়া ঃ ১০০/- টাকা মাত্র

SIDDIKSRESTHA : The life sketch of Hazrat Abu Bakr Siddik R. by Mohammad Mamunur Rashid and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigarh, Narayangonj, Bangladesh

Hadiya – Taka One Hundred only US$ 10

ISBN 984-70240-0069-9

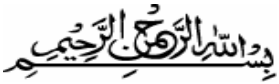

‘পৃথিবীপ্রসক্তি সকল অনিষ্টের উৎস’ এই মহাবাণীখানি অনুধাবন করতে হবে। বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে— আত্মা দিয়ে, সত্তা দিয়ে। পৃথিবী তো মহাজীবনের পথের একটি সময়সন্ধি মাত্র। পথিপার্শ্বের একটি বৃক্ষচ্ছায়া, অস্থায়ী-অসম্পূর্ণ, চলমান একটি অধ্যায়। এই অধিবাস ছেড়ে চলে যেতেই হবে। সুতরাং এখানকার প্রসক্তি-আসক্তি অসিদ্ধ ও নিষিদ্ধ।

কিন্তু এই জ্ঞান সকলে পায় না। শিক্ষাগ্রহণ করলে শিক্ষিত হওয়া যায়, জ্ঞানী হওয়া যায় না। জ্ঞানীগণই নির্ভুল গন্তব্যাভিসারী, অনিষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতিবিমুক্ত।

অগ্নিনির্ধারণের বিষয়টিও এখানেই নিশ্চিত করতে হবে। ঠিক করতে হবে কোন্ আগুনে পুড়বো আমরা— এ বেলায় তওবার আগুনে, না ও বেলায় জাহান্নামের আগুনে। সত্য শুভ ও সুন্দর। অসত্য শুভ নয়। সুন্দরও নয়।

সত্যপথের পথপ্রদর্শক যাঁরা, তাঁরাই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ— নবী ও রসুল। তাঁরাও সত্যাধিষ্ঠিত, যাঁরা ওই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের অনুগমনধন্য। তাঁরাই ‘সিদ্দিক’। আর তাঁদের শ্রেষ্ঠতমজন হচ্ছেন সর্বশেষ ও সর্বমহান রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম সহচর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদ্বিআল্লাহু আনহু।

ভালোবাসা প্রেমিক-প্রেমাস্পদকে একাত্ম ও একপ্রাণ করে দেয়। রসুলুল্লাহ স. এবং হজরত আবু বকর ছিলেন সেরকম। আর ভালোবাসা হয় নিক্ষয়, নির্নিমেষ ও চিরপ্রবহমান। তাঁদেরই প্রেমপ্রবাহ চিরবিজয়ের মহিমা নিয়ে এখনো বয়ে চলেছে। চলবে ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ না ধ্বনিত হয় মহাপ্রলয়সূচক শিঙ্গার ফুৎকার।

এই পথই জ্ঞান ও প্রেমের পথ। সত্যপথ। এই পথের কথাই আমরা বলে চলেছি বিরতিহীনভাবে বহুবিধ বাক্যসম্ভারে। আমাদের প্রকাশনাপ্রবাহে রয়েছে গতিময়তা ও প্রেমময়তার আহ্বান। সত্য পথাকাঙ্ক্ষীগণ আসুন। গ্রহণ করুন নেসবতে হুব্বী (ভালোবাসার তরিকা) যার অন্য নাম কখনো নেসবতে সিদ্দিকি, কখনো নক্শবন্দিয়া, কখনো মোজাদ্দেদিয়া, কখনো শুধুই মোজাদ্দেদিয়া (খাস মোজাদ্দেদিয়া)।

পীর-মোর্শেদ ছাড়া এ পথে চলা যায় না। তাঁরাই 'সদিক্বীন' (সত্যবাদী)। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁদের সঙ্গী হতে নির্দেশ করেছেন। বলেছেন 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সত্যবাদীগণের সঙ্গী হয়ে যাও'।

সিদ্দিকশ্রেষ্ঠ আমাদেরকে সত্যবাদিতার পথ দেখাবে— এমতো আশা বুকে নিয়েই আমরা এর প্রকাশ ঘটাতে চললাম। আমরা তো অকিঞ্চন, সত্যধর্ম প্রচার-প্রসারকর্মের নগণ্যাতিনগণ্য খাদেম (পরিচারক)। আমাদের অন্তরোৎসারিত প্রার্থনা 'আমরা তোমারই ইবাদত করি, এবং শরণ যাচনা করি কেবলই তোমার'।

প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তব-স্তুতি-মহিমা-মহত্ব-উচ্চতা-পবিত্রতা কেবলই তোমার। হে আমাদের জীবন-মৃত্যুপ্রদাতা ভালোবাসাদাতা আল্লাহ্! আমাদেরকে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ করো তাঁদের, যাঁদেরকে তুমি ভালোবেসেছো এবং যাঁরা ভালোবাসেন তোমাকে।

সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ ও সালামসম্ভার অনন্তকাল ধরে অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষিত হয়ে চলুক মহানবী মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি। তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ অন্য সকল নবী-রসুলগণের প্রতি। সকল সাহাবী, আউলিয়া-দরবেশ-গাউস-কুতুবগণের প্রতি। আমাদের পরম প্রিয় পীর-মোর্শেদ হজরত হাকিম আবদুল হাকিমের প্রতি। আমিন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা এদেশ থেকে এবং এই পৃথিবী থেকে কাদিয়ানি, মওদুদী ফেৎনাকে এবং তাদের প্রতি মমত্ব-পোষণকারীদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

প্রারম্ভে ও অবশেষে শুভবারতা-শান্তিসম্ভাষণ-সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

সত্যের শিখরে ওড়ে তোমার নিশান
গারে সুর সাক্ষী আজো তোমার প্রেমের
মরু মক্কা মদীনার সাইমুম-শান
রসুলের সাথী তুমি সব রকমের।
তোমার সীনায় হাসে জান্নাতের ছবি
আখেরী নবীর মতো প্রেমের বাহার
কলিজা বদল ক'রে পেলে পূর্ণ রবি
ছড়ালে তেমনি জ্যোতি ছায়া তুমি যার।

ফারূকের ইনসাফ আলীর কুওত
ওছমান গনি, গুণী আসহাব যতো-
তোমারই কারণে পায় নাজ নেয়ামত
তামাম উম্মতও পায় নূর অবিরত।

আমীরুল মোমেনীন সিদ্দিকে আজম
তোমার এসেমে শুধু আল্লাহ্‌র রহম।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী (১-২) মোট ২ খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
হাজ্রাতুল কুদুস প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড
নকশায়ে নক্শবন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নূরে সেরহিন্দ ◆আল্লাহ্র জিকির ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী ◆ জননীদের জীবনকথা

আবার আসবেন তিনি ◆ অগ্নি ও উদ্যানের সংবাদ
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆ মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆রমজান মাস ◆ চেরাগে চিশ্তী
BASICS IN ISLAM ◆ ইসলামী বিশ্বাস
মালাবুদ্দা মিনহু ◆ কোরআন ও তাজবীদ শিক্ষা

কাব্য সংকলন ◆ সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆ সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

এক

কোনো কোনো স্বপ্ন সত্যের মতো সুন্দর। সৌগন্ধশোভিত। বাস্তবের মতো প্রভাবময়। কিন্তু তার প্রকাশের আপেক্ষায় থাকতে হয়। কী হবে, কেমন হবে, কোথায় ঘটবে— জানতে ইচ্ছা করে।

হজরত আবু বকর রা. এক রাতে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন। তিনি বলেন— হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের দায়িত্বপ্রাপ্তির পূর্বে এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, মহাকাশ থেকে একটি বিশাল নূরের জ্যোতিচ্ছটা কাবাগৃহের উপরে পতিত হলো। তার জ্যোতিরশ্মি ছড়িয়ে পড়লো মক্কা নগরীর সকল ঘর-বাড়িতে। শেষে এসে স্থির হলো আমার ঘরে। এরপর আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলাম। পরদিন এক ইহুদী ধর্মযাজকের কাছে গেলাম। আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন, এসব তোমার কল্পনা-খেয়াল মাত্র।

কয়েক বৎসর পরের ঘটনা। একবার এক সফরের সময় এক দরবেশের সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা জানালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি কুরায়েশ বংশোদ্ভূত। তিনি বললেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের মধ্যে একজন রসুল প্রেরণ করবেন। তুমি তাঁর প্রধান সহচর হবে। আর তাঁর মহাতিরোধানের পরে হবে তাঁর প্রথম ও প্রধান খলিফা।

আর একটি ঘটনা— তিনি বলেন, আমার বয়স যখন বিশ, তখন আমি মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সঙ্গে বাণিজ্য ব্যপদেশে সিরিয়া গমন করলাম। পথিমধ্যে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি করতে হলো। সেখানে ছিলো একটি কুল বৃক্ষ। নিকটেই বাস করতো এক খৃষ্টান দরবেশ। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. কুল বৃক্ষের নিচে উপবেশন করলেন। আমি

দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। আমাকে দেখে দরবেশ এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, গাছের ছায়ায় যিনি বসে আছেন, তিনি কে? আমি বললাম, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

দরবেশ বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি নবী। আল্লাহ্‌র নবী ছাড়া এই গাছের নিচে কেউ বসেন না। এর আগে এখানে বসেছিলেন নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম।

এখন বসলেন শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ স.।

সেদিন থেকে দরবেশের বাণী আমার অন্তরে জেগে রইলো। আমার জীবন ও সময়ের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো আশা ও অপেক্ষার দিবস-রজনী। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস।

দুই

নবী ইব্‌রাহীমের সময় থেকেই মহাতীর্থ মক্কা সুবিখ্যাত। হজ ও ওমরা উপলক্ষে সারা বিশ্বের মানুষ এখানে ছুটে আসে। কাবা শরিফের এমতো অনন্য ধর্মীয় মহিমা দেখে খৃষ্টান বাদশাহ্‌ আবরাহা হিংসায় জ্বলতে থাকে। সে নিজে একটি ধর্মমন্দির বানিয়েছিলো। চেয়েছিলো সারা বিশ্বের মানুষ তার মন্দির দর্শনের জন্য সেখানে সমবেত হোক। কিন্তু মানুষ সেখানে গমনের কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতো না। সে ভাবলো, কাবাগৃহ ধ্বংস করতে হবে। তাহলে লোকেরা বাধ্য হয়ে তার মন্দির দর্শন করতে যাবে। এরকম পাপভাবনার সংকল্প করে সে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে কাবাগৃহ ধ্বংস করতে চললো।

কাবাগৃহ হলো আল্লাহ্‌র ঘর— বায়তুল্লাহ্‌। তিনি নিজে বায়তুল্লাহ্‌ হেফাজত করলেন। তাঁর নির্দেশে আকাশে অবতীর্ণ হলো অসংখ্য আবাবিল পাখি। প্রত্যেকে পায়ে করে নিয়ে এলো ছোট ছোট পাথরকণা। সেগুলো নিক্ষেপ করলো হস্তিবাহিনীর উপরে। ফল হলো এরকম— বাদশাহ্‌ আবরাহা, তার পুরো সেনাদল ও সকল হাতি প্রস্তরাঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে বিস্তির্ণ বালুকা প্রান্তরে মরে পড়ে রইলো।

এই ঘটনার বৎসরকে হস্তিবৎসর বলা হয়। এই ঘটনার ৫৫ দিন পর মহাআবির্ভাব ঘটে শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর। আর তাঁর প্রধান সাথী এবং অন্তরতম বন্ধু হজরত আবু বকর জন্মগ্রহণ করেন ওই ঘটনার দুই বৎসর চার মাস পরে। এই হিসেবে দেখা যায় হজরত আবু বকর রা. ছিলেন রসুলুল্লাহ স. এর চেয়ে বয়সে দুই বৎসর আড়াই মাসের ছোট।

কুরায়েশ বংশের একটি শাখা গোত্রের নাম তামীম। ওই তামীম বংশেই জন্মগ্রহণ করেন হজরত আবু বকর। মাতা-পিতা তাঁর নাম রাখেন আবদুল কাবা। রসুলুল্লাহ তাঁর ইসলামপরবর্তী নাম দেন আবদুল্লাহ। পরে নাম হয় 'সিদ্দিক' ও 'আতিক'।

তাঁর পিতার নাম ওসমান। কিন্তু সবাই তাঁকে বলতেন আবু কোহাফা। আর তাঁর মায়ের নাম সালমা। তবে তাঁর সর্বজনসম্বোধিত নাম উম্মুল খায়ের। হজরত আবু বকরের বংশগত সম্পর্ক পিতা-মাতা উভয় দিক দিয়ে ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ মোররা ইবনে কা'ব পর্যন্ত গিয়ে রসুলুল্লাহ স. এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

তিন

কাবাগৃহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতো কুরায়েশদের কয়েকটি শাখা গোত্র। হাজীদের জন্য পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করতো বনী আবদে মানাফ। কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরামর্শসভা (দারুন নাদ্ওয়া) পরিচালনা করতো বনী আবদুদ্দার। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে জাতীয় পতাকাও বহন করতো তারা। যুদ্ধকালে সেনাপতি হতো খালেদ বিন ওলীদের গোত্র বনী মাখযুম। আর হত্যাকাণ্ডের বদলা (কেসাস) ও রক্তপণ (দীয়াত) নির্ধারণ করতো হজরত আবু বকরের গোত্র বনী তামীম।

সমাজের লোকেরা তাঁর অভিমত ও উপদেশকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতো। রক্তপণ ও জরিমানার বিপুল অর্থ সকলে তাঁর কাছেই জমা করতো। তিনি সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে যথাপাত্রে বিতরণ করে দিতেন। এছাড়া অনেকে তাদের অর্থ ও মালমাত্তা তাঁর কাছে আমানত হিসেবে রেখে দিতো। রাসুলুল্লাহ স. এর মতো তিনিও ছিলেন নির্ভরযোগ্য আমানতদার।

সমাজে প্রচলিত ছিলো মূর্তিপূজা এবং বহুবিধ পাপানুষ্ঠান। কন্যাসন্তান হত্যা, সুদ, ব্যভিচার, মদ্যপান ছিলো অবাধ। এ সকল কাজে কেউ কাউকে সংযত হতে বলতো না। এরকম পাপময় পরিস্থিতির মধ্যেও হাশেমী বংশের এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক শাখাগোত্রের লোক ছিলেন পাপমুক্ত। তাঁরা মূর্তিপূজা করতেন না। মদ্যপান করতেন না। পাপাসক্তিকে প্রশ্রয় দিতেন না কোনোক্রমেও। হজরত আবু বকর ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মদ্যপান অনুষ্ঠানে কেউ আমন্ত্রণ জানালে তিনি বলতেন, এ সকল কাজ অসম্মানজনক। এমন আমন্ত্রণ কখনো কেউ যেনো আমাকে না করে।

তাঁর এমতো পুতঃপবিত্র স্বভাব ও মনোভাবের কারণেই রসুলুল্লাহ স. তাঁকে বাল্যবেলা থেকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁদের সম্পর্ক এতোই ঘনিষ্ঠ ছিলো যে, তাঁরা পরস্পর পৃথক হতেন খুব কম সময়ের জন্য। এ সম্পর্কে তাঁর কন্যা উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেছেন, যখন থেকে আমি বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই আমি আমার পিতা-মাতা উভয়কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অবস্থায় রসুলুল্লাহ স. এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ পেয়েছি। এমন কোনো দিন অতিবাহিত হয়নি, যেদিন আল্লাহ্‌র রসুল সকালে বিকালে দুইবার আমাদের গৃহে যাতায়াত করেননি।

ব্যবসায়ী হিসেবেও তিনি ছিলেন সফল ও বিখ্যাত। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁকে অনেক বার সিরিয়া, বসরা, ইয়েমেন— এ সকল অঞ্চলে সফর করতে হয়েছে। প্রথমে ছিলেন পিতার ব্যবসায়ের প্রতিনিধি। পরে ব্যবসা করতেন স্বত্বাধিকারীরূপে একক উদ্যোগে। কয়েকবার আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে যৌথভাবেও বাণিজ্যসফর করেছেন। তিনি ছিলেন কুরায়েশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিত্তবান। ছিলেন অশেষ ছাগল, মেষ ও উটের মালিক।

আল্লাহ্‌র রসুলকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তাঁর ঘরে উত্তম আহার্যের আয়োজন করা হলে তিনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসুলের সমীপে তা উপস্থিত করতেন। অধিকাংশ সময় হাজির করতেন যয়তুনের তেলে ভাজা রুটি। একবার যখন রসুলুল্লাহ স. তাঁর চাচার সঙ্গে সিরিয়া রওয়ানা হলেন, তখন হজরত আবু বকর তাঁর সঙ্গে দিলেন এরকম অনেক খাদ্য। আর খেদমতের জন্য একজন গোলাম।

চার

এর মধ্যে অনেক দিন গত হয়ে গেলো। মহানগরী মক্কায় ঘটে গেলো অনেক ঘটনা। মহানবী স. বিবাহ করে সংসারী হলেন। সহধর্মিণী হিসেবে পেলেন মহাপুণ্যবতী হজরত খাদিজাকে। সন্তান-সন্ততির জনক হলেন। সংসার বড় হলো। এভাবে পৌঁছলেন চল্লিশ বৎসর বয়সে।

ভ্রষ্টতার অমারজনী শেষ হয় হয় অবস্থা। প্রায়ান্ধকার প্রত্যুষ সমাগতপ্রায়। মহানবী স. হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন হলেন। তাঁর মহাধ্যানের মহিমা বেয়ে নেমে এলো প্রত্যাদেশ। ওহীবাহক ফেরেশতা হজরত জিব্‌রাইল এসে জানালেন— তিনিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল। তাঁর প্রচারিতব্য ধর্মের নাম ইসলাম। এই ধর্মই মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালক আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। নির্দেশ ঘোষিত হলো— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবহক! সত্য ধর্মের প্রচার করুন।

তিনি সত্য ধর্মের প্রচার শুরু করে দিলেন। প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করলেন মহাপুণ্যবতী হজরত খাদিজা। হজরত আলী তখন দশ বৎসরের বালক মাত্র। মহানবী স. এর গৃহেই প্রতিপালিত হচ্ছিলেন তিনি। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। মহানবী স. এর গোলাম হজরত যায়েদও ছিলেন তাঁর পরিবারভূত। তিনি স. তাঁকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন পুত্র হিসেবে। তিনিও শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসকে বক্ষবদ্ধ করে নিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিকও এঁদের আগে অথবা তাঁদের পর পর হয়ে গেলেন বিশ্বাসী-ইমানদার— পরবর্তীতে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক ।

কুরায়েশ সর্দারেরা সচকিত হলো। বুঝে উঠতে পারলো না কী করবে তারা। আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ কোথা থেকে পেলো এই নতুন ধর্মমত। পিতৃপুরুষদের ধর্মাদর্শবিরোধী হলো সে কার প্ররোচনায়? কেনো? নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারা কোনো উত্তর খুঁজে পেলো না। শেষে স্থির করলো তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বকরকে এ সকল কথা জানাতে হবে।

হজরত আবু বকর তখন বাণিজ্য ব্যপদেশে মাসাধিককাল ধরে অবস্থান করছেন ইয়েমেনে। সুতরাং তাদেরকে প্রতীক্ষা করতে হলো। দু' একটি দিন যেতে না যেতেই হজরত আবু বকর মক্কায় ফিরে এলেন। সাথে সাথে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো কুরায়েশ নেতৃবর্গ আবু জেহেল, ওতবা, শায়বা প্রমুখ। হজরত আবু বকর তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কী, নতুন কোনো খবর আছে নাকি? তারা সোৎসাহে বলে উঠলো, আছে বৈকি। শোনোনি বুঝি, আবু তালেবের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ নতুন এক ধর্মের প্রবক্তা সেজেছে। সে বলছে, আল্লাহ্ নাকি তাকে নবী বানিয়েছেন। আরও বলছে, আমাদের দেবদেবী সব মিথ্যা। একমাত্র সত্য আল্লাহ্। এই বলে তারা হাসাহাসি শুরু করে দিলো।

হজরত আবু বকর গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভাবলেন, যিনি জীবনে কখনো মিথ্যা বলেননি, তিনি কেনো এখন মিথ্যা বলতে যাবেন। বললেন, ঠিক আছে, তোমরা এখন যাও। আমি ব্যাপারটা প্রথমে ভালো করে জেনে নেই। তারপর তোমাদের সাথে কথা হবে।

নেতাদেরকে বিদায় দিয়ে তিনি আর বিলম্ব করলেন না। উপস্থিত হলেন মহানবী স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। প্রশ্ন করলেন, আপনি নাকি নতুন ধর্মমত প্রচার করছেন। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত আবু বকর বললেন, সে ধর্মের মূল কথা কী? তিনি স. বললেন, এ ধর্মের মূল কথা হলো আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি আমাকে প্রত্যাদেশবাহক করে পাঠিয়েছেন। প্রচার করতে বলেছেন এই মহাবাণীখানি— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

একথা শুনে হজরত আবু বকর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলেন।

পাঁচ

কুরায়েশ নেতৃবর্গ ভেবেছিলো, আবু বকরই মোহাম্মদের ভুল ভাঙাতে পারবে। কিন্তু যখন দেখলো সেও দল ছুট হয়ে গেলো, তখন সকলের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করলো। অন্তর্ক্রোধে জ্বলতে লাগলো তারা। ধীরে ধীরে

ক্রোধ প্রশমন করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু পারলো না। কারণ আবু বকর নিজে নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়েই ক্ষান্ত হলো না। বরং সে হয়ে উঠলো মোহাম্মদের নতুন ধর্মের প্রধান প্রচারসহযোগী।

হজরত আবু বকর তাঁর বন্ধুমহলে ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর আমন্ত্রণউদ্যোগে সাড়া দিলেন কেউ কেউ। মহানবী স. নিজে বলেছেন, 'আমার আহ্বানে লোকেরা কিছুটা ইতস্ততঃ করতো, কিন্তু আবু বকরের আহ্বানে তা করতো না।' তাঁর আমন্ত্রণে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন হজরত ওসমান, হজরত যোবায়ের, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত তালহা রদ্বিআল্লাহু আনহুম। এই বুজর্গগণ ছিলেন নেতৃস্থানীয়। তাই কুরায়েশেরা তাঁদের উপর ক্ষিপ্ত হলেও তাঁদেরকে সরাসরি আক্রমণ করতে পারলো না। কিন্তু তারা অত্যাচার করতে শুরু করলো ক্রীতদাসদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করলেন যাঁরা, তাদেরকে।

হজরত বেলাল ছিলেন উমাইয়ার গোলাম। ইসলামগ্রহণের কারণে সে তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে দিলো। প্রথমে তাঁকে শাস্তি দিলো এভাবে— বখাটে বালকদেরকে বললো, এর গলায় রশি লাগিয়ে মক্কার পথে পথে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াও। তারা নির্দেশমতো সারাদিন তাঁকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়ালো। উমাইয়া বললো বল্, মোহাম্মদের ধর্ম পরিত্যাগ করবি কিনা? তিনি বললেন, না। উমাইয়া নতুন নিয়মে অত্যাচার শুরু করলো। তাঁর হাত পা বেঁধে প্রখর রৌদ্রতপ্ত বালুকার উপরে তাঁকে শুইয়ে দিলো। বুকের উপর চাপা দিলো প্রকাণ্ড পাথর। বললো, ভালো চাস্তো এখনই ইসলাম ত্যাগ কর্। হজরত বেলাল বললেন, বলতেই থাকলেন, আহাদ, আহাদ। এক— সেই অদ্বিতীয় এক।

হজরত আবু বকর ওই স্থানের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি সহ্য করতে পারলেন না। উমাইয়াকে নম্র স্বরে উপদেশ দিলেন। উমাইয়া তাঁর কথার কোনোই গুরুত্ব দিলো না। ব্যঙ্গ করে বললো, বেশতো অতোই মায়া লাগে যদি, তবে ওকে কিনে নিয়ে আজাদ করে দিলেই তো পারো। হজরত আবু বকর নীরবে ঘরে ফিরে এলেন। পরদিন গিয়ে অনেক টাকা দিয়ে হজরত বেলালকে খরিদ করলেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রসুলুল্লাহ স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি

বেলালকে মুক্তি দিলাম। রসুলুল্লাহ স. অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আর সেদিন থেকে হজরত বেলাল হয়ে গেলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ খাদেম।

এরপর আরও কয়েকজন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন হজরত আবু বকর। যেমন হজরত আমর ইবনে ফুহায়রা, হজরত নাজিরা, হজরত নাহদীয়া, হজরত জারিয়া, বনী মুমেন বিনতে নাহদীয়া প্রমুখ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা।

তাঁর পিতা তাঁর এসকল কাজ পছন্দ করলেন না। বললেন, বৎস! এসকল দুর্বল ক্রীতদাস-দাসীদের জন্য তুমি এতো টাকা খরচ করছো কেনো? এতে কী লাভ? হজরত আবু বকর জবাব দিলেন, হে আমার পিতা! এ ব্যবসায়ে যে কতো লাভ, তা আপনি বুঝতে পারবেন না।

আবু কোহাফা একদিন হজরত আলীকে দেখেও উষ্মা প্রকাশ করলেন। বললেন, এই ছোঁড়াগুলোই আমার ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

ছয়

শুধু ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী নয়। মক্কার অংশীবাদীরা এবার জুলুম শুরু করলো সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের উপরেও। রসুলুল্লাহ স.ও তাঁদের নিষ্ঠুর আক্রমণের শিকার হলেন।

একবারের ঘটনা— মুশরিকেরা কাবাপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে পরামর্শ বিনিময় করছিলো। একজন বললো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো না, মোহাম্মদ আমাদের পরমপূজনীয় দেব-দেবীদেরকে কীভাবে অপমান করে চলেছে। তোমরা দুর্বলতা প্রকাশ করছো বলেই তো সে এরকম করার সাহস পাচ্ছে। কী— এর একটা বিহিত তোমরা করবে কিনা, বলো?

মহানবী স. সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখেই তারা চিৎকার করে বলে উঠলো, মোহাম্মদ! তুমি নাকি আমাদের দেব-দেবীদের দুর্নাম করে বেড়াও। তিনি স. বললেন, আমি তো সত্য কথাই বলি। এ কথা বলার সাথে সাথে এক পাপিষ্ঠ দৌড়ে এসে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর ছিনিয়ে নিলো। তারপর ওই চাদর দিয়ে তাঁর গলা পেচিয়ে ধরলো। তারপর চাদরের

প্রান্তদেশ ধরে জোরে টানতে শুরু করলো। শ্বাসরোধ হতে লাগলো মহানবী স. এর। সংবাদ পেয়ে দ্রুত ছুটে এলেন হজরত আবু বকর। দুর্বৃত্তদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিলেন তাঁকে। বললেন, সাবধান হও। 'একমাত্র আল্লাহ্ আমাদের প্রভুপালক' এ কথা বলার কারণে তোমরা কি একজন মানুষকে হত্যা করবে? দুর্বৃত্তরা নিবৃত্ত হলো না। এবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো হজরত আবু বকরের উপরে। ইচ্ছেমতো প্রহার করলো তাঁকে। এভাবে আরও কয়েকবার তিনি মহানবী স. কে কাফেরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করলেন। অত্যাচারের ভয়ে ইসলাম প্রচারের কাজও বন্ধ করলেন না। পিতামাতাকেও আমন্ত্রণ জানালেন। পিতা রাজী হলেন না। কিন্তু মাতা কবুল করলেন।

একদিন সকালে তিনি তাঁর মাকে নিয়ে রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হলেন। বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মা এসেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। রসুলুল্লাহ স. তাঁর দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকালেন এবং তাঁকে দীক্ষা দিলেন মহানতম ধর্ম ইসলামের। তখন মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৯।

আবু লাহাব ছিলো রসুলুল্লাহ স. এর চাচা— কিন্তু জানের দুশমন। তার স্ত্রী উম্মে জামিলাও ছিলো তার স্বামীর অনুগামিনী। তারা রসুলুল্লাহ স. এর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতো। তাঁকে দেখলেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতো। বিপুল ধনসম্পদ ও গোত্রনেতৃত্বের অহংকারে ডুবে থাকতো তারা। আল্লাহ্পাক তাদের প্রতি অতুষ্ট হলেন। অবতীর্ণ করলেন সুরা লাহাব। সেখানে ঘোষিত হলো তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা।

একদিন রসুলুল্লাহ স. ও হজরত আবু বকর কাবাপ্রাঙ্গণের পাশে বসেছিলেন। এমন সময় সেখানে চরম উত্তেজিত অবস্থায় উপস্থিত হলো উম্মে জামিলা। হাতে তার একটি ভারী প্রস্তরখণ্ড। আল্লাহ্পাক তার দৃষ্টিকে অর্ধঅন্ধ করে দিলেন। ফলে সে কেবল হজরত আবু বকরকে দেখতে পেলো। রসুলুল্লাহ স. কে দেখতে পেলো না। সে রাগে গর্জন করতে করতে বললো, আবু বকর! তোমার সাথী কোথায়? শুনতে পেলাম তার উপরে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশে নাকি আমাদের ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আমি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করবো। সে আরও অনেক কটুবাক্য বর্ষণ করতে করতে প্রস্থান করলো। হজরত আবু বকর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ!

সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? তিনি স. বললেন, না। আল্লাহ্তায়ালা তাকে আমার বিষয়ে অন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সাত

অতি ধীরে হলেও মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। সেই সঙ্গে বেড়ে যেতে লাগলো কাফের কুরায়েশদের হিংসা, শত্রুতা, ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ ও অত্যাচার। তারা রসুল স. কে 'মুজাম্মাম' (ঘৃণিত) বলে ডাকতো। তিনি সবকিছু নীরবে সহ্য করে যেতেন। কখনো কখনো অন্তরঙ্গ সহচরদের সমাবেশে বলতেন, তোমরা কি দেখছো না, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে বিদ্রূপমুক্ত করে রেখেছেন। তারা আমাকে বলে 'মুজাম্মাম' অথচ আমি 'মোহাম্মদ' (প্রশংসিত)।

দুঃখ-কষ্ট ভরা দিবস-রজনী যেনো কাটতেই চায় না। তবুও সময় এগিয়ে চলে। তার গতি অতি মন্থর, কিন্তু চলমান। এভাবে এক সময় সত্যিই অতিবাহিত হলো দুষ্কালের দিবানিশি ভরা পাঁচ পাঁচটি বছর। ইতোমধ্যে ঘটলো দু'টি বিশেষ ঘটনা। অমিততেজা বীর হজরত হামযা ও হজরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর আগে মক্কার বাইরের অঞ্চল থেকে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন গিফার গোত্রের হজরত আবু যর। এ সকল ঘটনায় কাফের কুরায়েশেরা স্তম্ভিত হয়েছিলো বটে, কিন্তু দমে যায়নি। বরং হিংসা ও শত্রুতার আগুন অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করেছে।

মহানবী স. ভাবতে শুরু করলেন, কীভাবে তিনি নিষ্ঠুর কুরায়েশদের হাত থেকে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বাঁচাবেন। শান্তির সঙ্গে আল্লাহ্র ইবাদত করতে হলে তবে কি এই পবিত্র মক্কা শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে? নবী ইব্রাহীম আ. হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ্র দুনিয়াতো অনেক বড়। আর তিনিই তো রিজিকদাতা, নিরাপত্তাপ্রদাতা। তিনি স. তাঁর সহচরদের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। শেষে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। এক সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে আবিসিনিয়া অভিমুখে পবিত্র মক্কা ত্যাগ করে গেলেন সাহাবীগণের একটি দল।

হজরত আবু বকর ব্যক্তিগতভাবে কাফেরদের সরাসরি আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তারা তাঁকে বিষ নজরে দেখতো। কিন্তু তিনি তাঁর প্রচারপ্রচেষ্টা থেকে কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না। হজরত তালহা বিন আবদুল্লাহ তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন। মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ কথা শুনে তাঁর চাচা নওফেল ইবনে খাওলিদ দু'জনকে একত্রে বেঁধে প্রহার করলেন। তাঁর বংশের কোনো লোক তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলো না। এই ঘটনার পর হজরত আবু বকর হিজরত করবেন বলে মনস্থির করলেন। এই মর্মে মহানবী স. এর কাছে অনুমতিপ্রার্থী হলেন। তিনি স. অনুমতি দিলেন।

হজরত আবু বকর আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করার পর যখন বারকুল গামাদ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন সাক্ষাৎ ঘটলো কারা জাতিগোষ্ঠীর নেতা ইবনে দাগেনার সঙ্গে। ইবনে দাগেনা হজরত আবু বকরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছেন? হজরত আবু বকর বললেন, মক্কার লোকেরা আমাকে কষ্ট দেয়। তাই অন্য কোথাও গিয়ে শান্তির সঙ্গে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে চাই। ইবনে দাগেনা বললেন, তা হবে কেনো? আপনার মতো লোককে আমরা ছাড়তে পারি না।

হজরত আবু বকর তার সাথে মক্কায় ফিরে এলেন। ইবনে দাগেনা মক্কার সরদারদেরকে বললো, তোমরা কেমন মানুষ! তোমরা এমন এক সাধুপুরুষকে মক্কা থেকে বের করে দিচ্ছো, যিনি অতিথিপরায়ণ, দরিদ্রদের বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের ভরনপোষণকারী এবং বিপদকবলিতদের ভ্রাতা। সর্দারেরা বললো, ঠিক আছে। আমরা তাকে এই শর্তে থাকতে দিতে পারি, সে যেনো তার ইবাদতের সময় নীরবে কোরআন পাঠ করে। জোরে পাঠ করলে আমাদের সন্তান-সন্ততি ও মহিলারা প্রভাবিত হয়।

হজরত আবু বকর তাদের শর্ত মেনে নিলেন। কয়েকদিন পর তিনি তাঁর বাড়ীর উঠানে একটি মসজিদ তৈরী করলেন। প্রথমে কোরআন পাঠ করলেন নীরবে। পরে প্রবল প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। ভেঙে গেলো মৌনতার বাঁধ। উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ শুরু করলেন। তাঁর কোরআন পাঠ শুনে শিশু ও নারীগণ ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। কুরায়েশেরা ইবনে দাগেনাকে ডেকে আনলো। অভিযোগ করলো শর্ত ভাঙার। ইবনে

দাগেনা হজরত আবু বকরের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আবু বকর! এখন তো আমি তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি না। হজরত আবু বকর বললেন, ঠিক আছে। তোমার আশ্রয় আমি চাই না। আমি চাই কেবল আল্লাহ্‌র আশ্রয়।

এই ঘটনার পর একদিন তিনি কাবাগৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। এক দুর্বৃত্ত তাঁর মাথায় ধূলিবালি নিক্ষেপ করলো। অংশীবাদী ওলীদ ইবনে মুগিরাকে সামনে পেয়ে হজরত আবু বকর বললেন, দ্যাখো, দুর্বৃত্তটি আমার কী অবস্থা করেছে। সে বললো, তুমিতো স্বেচ্ছায় বিপদগ্রস্ত হয়েছো। এ তোমার কর্মফল। হজরত আবু বকর বললেন, ইয়া আল্লাহ্‌! কী অসীম তোমার ধৈর্য! কী অপার তোমার সহিষ্ণুতা!

ওদিকে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীরা শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন হিজরতকারীদের আর একটি দল। কিন্তু মক্কার অবস্থা বদল হলো না। বরং হয়ে পড়লো অধিকতর সংকটাপন্ন। পৌত্তলিক কুরায়েশদের গোত্রপতিরা নিজেদের মধ্যে সভা করে ঠিক করলো, বনী হাশেমকে তারা প্রত্যাখ্যান করবে। সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করবে তাদের সঙ্গে। দেখা-সাক্ষাৎ, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু বন্ধ। খাদ্য সরবরাহও বন্ধ থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ না তারা মোহাম্মদকে হত্যার জন্য তাদের কাছে সমর্পণ করে। এইমর্মে তারা একটি চুক্তিপত্র লিখলো। গোত্রপতিরা সকলে স্বাক্ষর করে চুক্তিপত্রটি ঝুলিয়ে দিলো কাবাঘরের দেয়ালে।

হজরত আবু বকর হাশেমী বংশদ্ভূত ছিলেন না। তৎসত্ত্বেও সর্বশ্রেষ্ঠ এই নবীপ্রেমিক হাশেমী বংশের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। বরণ করলেন স্বেচ্ছাবন্দিত্ব শিয়াবে আবু তালেব বা আবু তালেব উপত্যকায় হাশেমী বংশের সঙ্গে। তিনি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে চললেন। এভাবে কেটে গেলো দীর্ঘ তিন তিনটি বৎসর।

অবরোধ শেষে আরও দু'টি বিশাল বিপদ সমুপস্থিত হলো। অল্পদিনের ব্যবধানে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন রসুলুল্লাহর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাপ্রদায়ক প্রিয় পিতৃব্য হজরত আবু তালেব এবং তাঁর প্রিয়তম জীবনসঙ্গিনী হজরত খাদিজাতুল কোবরা রা.।

হজরত আবু বকর রসুলুল্লাহর বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে কেবল তাকিয়ে থাকেন। বেদনাপিষ্ট হতে থাকেন মনে মনে। অপেক্ষা করতে থাকেন। নীড়হীন পাখির মতো সঙ্গিনীহীন নবী এখন কী করবেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিরা এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাঁর সংসারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। কিছুদিন পরে দেখলেন, মহানবী স. নিজে সংসার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। বিবাহ করলেন হজরত সাওদা রা.কে। হজরত আবু বকরও একান্ত শ্রদ্ধাভরে নতুন উম্মতজননীকে মনে মনে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নিলেন। তবু পুরোপুরি স্বস্তি পেলেন না কেনো যেনো। অনুভব করলেন, আল্লাহ্‌র রসুলের পবিত্র হৃদয়পুরে যেনো তবুও ভেসে বেড়াচ্ছে অতিসূক্ষ্ম শূন্যতার মেঘ। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর হৃদয়ের দুলালী হজরত আয়েশা রা. কে রসুলুল্লাহ স. এর বিবাহবদ্ধ করে দিলেন। উম্মতজননী হজরত আয়েশার বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর।

আট

হজরত আবু বকর নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে ভাবতেন না। তাঁর সার্বক্ষণিক ভাবনা ছিলো আল্লাহ্‌র রসুলের জন্য। আল্লাহ্‌র রসুলের উপরে আক্রমণ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু সব সময় সুযোগ হয়ে উঠতো না।

আবু জেহেল, আবু লাহাব, আসওয়াদ, ওলীদ, উমাইয়ারা নিত্যনতুন অত্যাচার করতে লাগলো। তারা তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতো, নামাজ পাঠ ও কোরআন তেলাওয়াতের সময় শিশ দিতো, হাততালি দিতো এবং হাসিঠাট্টা করতো। সেজদার সময় উটের নাড়িভুঁড়ি তাঁর উপরে নিক্ষেপ করতো। গলায় চাদর পেঁচিয়ে এমন জোরে টানতো যে, পবিত্র গলদেশে দাগ পড়ে যেতো। তাঁকে বলতো যাদুকর, পাগল।

রসুলুল্লাহ স. নিবৃত্ত হলেন না। মক্কার বাইরে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করলেন। গেলেন তায়েফে। সেখানকার মানুষকে আহ্বান জানালেন সত্যধর্ম ইসলামের দিকে। সেখানে তাঁর আমন্ত্রণ ব্যর্থ হলো। তিনি স. নিজেও

তাদের প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত হলেন। তবুও তাদের জন্য অপপ্রার্থনা করলেন না একথা ভেবে যে, হয়তো তারা পরে তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে। সকলে না হলেও কেউ কেউ হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে। যদি তা না করে, তবে হয়তো পরের প্রজন্মের সকলে অথবা কেউ কেউ করবে। কিংবা গ্রহণ করবে প্রজন্ম প্রজন্মান্তরের কেউ কেউ অথবা কোনো একজন।

মনোবেদনার ভারে ভারাক্রান্ত রসুল মক্কায় ফিরে এলেন। অপেক্ষায় রইলেন নতুন নির্দেশের। কিছুদিন পরেই ঘটলো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনাটি। ওই অবিস্মরণীয় বিস্ময় অন্তর্দেশে নিয়ে এলো শান্তি ও সান্ত্বনা। বিজয়মহিমার শুভসমাচার।

রসুলুল্লাহ স. রাতে কাবাপ্রাঙ্গণে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে ফেরেশতাদের অধিনায়ক হজরত জিব্‌রাইল রসুল স. কে বোরাকে আরোহণ করিয়ে প্রথমে নিয়ে গেলেন বায়তুল মাক্‌দিস মসজিদে। সেখানে সকল নবী-রসুল রূহানীভাবে উপস্থিত হলেন। রসুলুল্লাহ স. এর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হলো নামাজ। তারপর হজরত জিব্‌রাইল আবার তাঁকে বোরাকে উঠালেন। নিয়ে চললেন আকাশের দিকে। রসুলুল্লাহ স. প্রথম আসমানে দেখলেন দু'টি প্রবহমান নদী। হজরত জিব্‌রাইল বললেন, এই নদী দু'টি পৃথিবীর ফোরাত ও নীল নদীর উৎস। পুনরায় ঊর্ধ্বারোহণ করলেন তাঁরা। অতিক্রম করলেন সাত আসমান। সেখানে দেখলেন একটি অনিন্দ্যসুন্দর স্রোতস্বিনী। তার তটদেশে রয়েছে মোতি ও জবরযদ পাথর নির্মিত বিশাল প্রাসাদ। রসুল স. স্রোতস্বিনীর পানিতে হাত দিলেন। দেখলেন, পানি মেশকে আম্বরের সুবাসে ভরপুর। জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রাতা জিব্‌রাইল! এটা কী? জিব্‌রাইল বললেন, হাউজে কাওছার। এই হাউজ আপনার। আবার ঊর্ধ্বরোহণ শুরু হলো। পৌঁছলেন সিদ্‌রাতুল মুনতাহার সেই কুলবৃক্ষের নিকট। জিব্‌রাইলের যাত্রা শেষ হলো সেখানে। এরপর রফ্‌রফ্‌ নামক বাহনে চড়ে রসুলুল্লাহ স. এবার উপনীত হলেন আল্লাহ্‌ সকাশে। তখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর নৈকট্য দাঁড়ালো এরকম— যেনো ধনুকের দু'টি জ্যা। অথবা তদপেক্ষা নিকটতর। শুরু হলো একান্ত আলাপন। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করলেন, প্রার্থনা করো। রসুলুল্লাহ স. বললেন, তুমি ইব্‌রাহীমকে খলিল করেছো, মুসার সঙ্গে কথা বলেছো, দাউদকে বিরাট সাম্রাজ্যাধিপতি করেছো, তার জন্য লোহাকে দ্রবণীয় করেছো, সুলায়মানকে দান করেছো

এমন বিশাল সাম্রাজ্য, যেরকম সাম্রাজ্য আর কাউকে দাওনি, জ্বিন ইনসানকে, বাতাসকে তাঁর আজ্ঞাবহ করেছো, ঈসাকে তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছো, করেছো শ্বেতকুষ্ঠ ও জন্মান্ধকে নিরাময়প্রদায়ক, মৃতকে জীবনদানকারী, তাঁকে এবং তাঁর মাতাকে রেখেছো অভিশপ্ত শয়তানের অপপ্রভাব থেকে সততমুক্ত— তুমি আমার জন্য কোন্ অনুগ্রহ নির্ধারণ করেছো? আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন— তোমাকে আমি করেছি খলিল ও হাবীব (বন্ধু ও প্রিয়তম)। বানিয়েছি বিশ্বমানবতার জন্য দোজখের ভয়প্রদর্শক এবং বেহেশতের সুসংবাদদাতা। তোমার বক্ষদেশকে সম্প্রসারিত করেছি, তোমার পৃষ্ঠভগ্নকারী বোঝা লাঘব করেছি, তোমার স্মরণকে করেছি সমুন্নত— তাইতো আমার নামোচ্চারণের পরক্ষণে উচ্চারিত হয় তোমার নাম (কলেমায়, আজানে, একামতে, নামাজে)। তোমার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করেছি— তাদের অভ্যুদয় হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মধ্যস্থ করেছি, তাদেরকে করেছি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং আবির্ভাবে সর্বশেষ। তোমার উম্মত যদি গোনাহ্ করার পর এই সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি আমার বান্দা ও রসুল, তবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। আমি তোমার উম্মতের মধ্যে এমন এক দল সৃষ্টি করবো, যাদের কলব হবে ইঞ্জিল কিতাবের মতো বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। হে আমার প্রিয়তম প্রত্যাদেশবাহক! তোমাকে সৃষ্টিতে নবীগণের সর্বপ্রথম, প্রেরণে সর্বশেষ এবং মহাবিচারের দিনে সর্বপ্রথম করেছি। তোমাকে দান করেছি সাবায়ে মাসানী (সুরা ফাতেহা)। পূর্ববর্তী কোনো নবীকে এরকম দেওয়া হয়নি। আরশের নিম্নে রক্ষিত ধনভাণ্ডার থেকে তোমাকে সুরা বাকারার শেষ অংশ দান করেছি, কাওছার দান করেছি। আরও দান করেছি আটটি বিশিষ্ট নেয়ামত— ইসলাম, হিজরত, জেহাদ, নামাজ, জাকাত, দান খয়রাত, রমজানের রোজা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। আরও করেছি তোমাকে নিখিল বিশ্বের প্রারম্ভকারী এবং সমাপনকারী। তোমার উম্মতের মধ্যে যে আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করে না, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। নেক কাজের নিয়তের জন্য তোমার উম্মতকে একটি নেকি দেওয়া হবে— পুণ্য কর্ম করতে না পারলেও। কিন্তু বদ কাজের নিয়ত করলে কোনো গোনাহ্ লেখা হবে না,

যতোক্ষণ কেউ গোনাহ্ না করবে। হে আমার প্রিয়তম রসুল! আরও শোনো, তুমি বেহেশতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্য নবীরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তেমনি তোমার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে অন্যান্য নবীর উম্মতের আগে। হাউজে কাওছারও কেবল তোমার জন্য নির্ধারিত।

রসুলুল্লাহ স. নিবেদন করলেন, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপালক! তুমি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে প্রস্তরবর্ষণ দ্বারা শাস্তি দিয়েছো, তাদের কারও কারও জনপদ উল্টিয়ে দিয়ে তাদেরকে মাটিতে প্রোথিত করেছো, কারও কারও আকৃতি পরিবর্তন করে দিয়েছো— তুমি আমার উম্মতের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে? এরশাদ হলো, আমি তাদের উপর রহমতের ধারা বর্ষণ করবো। (তওবা করলে) তাদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিণত করে দিবো। তাদের দোয়া কবুল করবো। যে আমার উপর নির্ভর করবে, আমি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবো। যে চাইবে, তাকে দান করবো। গোনাহ্গারদের গোনাহ্ দুনিয়ায় গোপন রাখবো এবং আখেরাতে তোমার দ্বারা শাফায়াত করিয়ে নিবো। প্রিয়তম মোহাম্মদ! তুমি জানো কি তোমাকে এসকল নেয়ামত কী কারণে দেওয়া হলো? মহানবী মোহাম্মদ স. বললেন, হে আমার পরম প্রিয় প্রভু পরোয়ারদিগার! আমি যে তোমার বান্দা।

একান্ত আলাপন শেষ হলো। রসুলুল্লাহ স. কে উপহার হিসাবে দেওয়া হলো নামাজ। তাই নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। মেরাজের এই রহস্যময় ঘটনাটি ঘটলো ২৭শে রজবের রাতে। তখন মহানবী স. এর বয়স হয়েছিলো ৫২ বৎসর।

পরদিন সকালে তিনি তাঁর মেরাজরজনীর মহাকাশ ভ্রমণের কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেন। বিপুল জনরব সৃষ্টি হলো। গোত্রপতিরা ভাবলো, এইবার আবু বকরকে জব্দ করা যাবে। টলানো যাবে তার অন্ধ বিশ্বাসকে। তারা হজরত আবু বকর সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, শুনেছো, তোমার সাথী কী বলছে? সে নাকি গতরাতে বায়তুল মাক্দিস গিয়ে আবার রাতের মধ্যেই মক্কায় ফিরে এসেছে। হজরত আবু বকর বললেন, তাই নাকি? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁর এর চেয়ে বিস্ময়কর কথাগুলোকে বিশ্বাস করি। তাঁর প্রতি মহাকাশ থেকে প্রতিনিয়তই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়ে চলেছে। আমি তো সেগুলোকেও সত্য বলে মানি। একথা বলে সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হলেন মহানবী স. এর

মহান সান্নিধ্যে। তাঁর মুখে মেরাজের ঘটনাবলী শুনে নিয়ে বললেন, হে মহান আল্লাহ্‌র প্রিয়তম প্রাত্যাদিষ্ট পুরুষ! আপনি সত্য বলেছেন। তিনি স. বললেন, হে আবু কোহফাতনয়! তুমি সিদ্দিক (সত্যবাদী)।

নয়

মেরাজের ঘটনার পর থেকে বিপদ মুসিবতের কালো মেঘ আরও অধিক ঘনীভূত হলো। হজরত আবু বকর পুনরায় হিজরতের সংকল্প করলেন। ইতোমধ্যে মদীনায় ইসলামপ্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিলো। সেখানে ক্ষুদ্র হলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সংঘবদ্ধ একটি মুসলিম জামাত। সেখানেই হিজরত করতে মনস্থ করলেন তিনি। রসুলুল্লাহ স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মহানবী স. বললেন, তাড়াহুড়া কোরো না। সম্ভবতঃ আমার উপরে হিজরতের হুকুম অবতীর্ণ হবে। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারবো? তিনি স. বললেন, পারবে।

সেদিন থেকে আশায় ও আনন্দে বুক বেঁধে প্রহর গুণতে লাগলেন হজরত আবু বকর। প্রতীক্ষার পলগুলো যেনো কাটতেই চায় না।

উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, রসুলুল্লাহ স. সাধারণতঃ সকালে ও সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়ীতে আসতেন। একদিন তিনি স. হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন অসময়ে, কাপড়ে পবিত্র মুখমণ্ডল ঢেকে। ঘরের সকলকে সরে যেতে বললেন। হজরত আবু বকর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ঘরে তো কেবল আমার দুই কন্যা— আসমা ও আয়েশা। তিনি স. বললেন, প্রস্তুত হও। আজ রাতেই চলে যেতে হবে।

কুরায়েশ গোত্রপতিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, আজ রাতেই মোহাম্মদকে হত্যা করতে হবে। সকল গোত্রের এক জন করে যুবক রাতে তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে ফেললো। তাদের উপর নির্দেশ ছিলো সকালে যখন তিনি স. বাড়ীর বাইরে আসবেন, তখন একযোগে তারা তাঁর শরীরে তলোয়ারের আঘাত হানবে। কিন্তু তাদের সামনে দিয়েই তিনি স. বাড়ি থেকে বের

হলেন। তারা তাঁকে দেখতেই পেলো না। সোজা তিনি স. উপস্থিত হলেন হজরত আবু বকরের বাড়িতে। তিনি জেগেই ছিলেন। দরজা খুলে দিলে রসুলুল্লাহ স. তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন। সফরের সামান প্রস্তুত করা হলো। মালপত্র বেঁধে দিলেন হজরত আসমা ও হজরত আয়েশা। হজরত আসমা তাঁর কোমরবন্দ দুই ভাগ করলেন । তার একটি ফিতা দিয়ে বেঁধে দিলেন আহার্য সামগ্রীর পুটলি। সেদিন থেকে তিনি উপাধি পেলেন 'যাতুন্ নেকাতাইন' (দুই কোমরবন্দধারিনী)।

হজরত আবু বকর দুইটি উট আটশত দিরহাম দিয়ে আগেই কিনে রেখেছিলেন। সেগুলোকে পর্যাপ্ত বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করেছিলেন। একটির নাম দিলেন 'কাসওয়া'। ওইটিকেই নির্ধারণ করলেন রসুলুল্লাহ স. এর জন্য। তাঁর অমত সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ স. কাসওয়াকে কিনে নিলেন চারশ দিরহামের বিনিময়ে।

বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বের হলেন দু'জনে। হজরত আবু বকর নির্দেশ দিলেন, উট দুটোকে যেনো তৃতীয় রাতে সওর পর্বতের গুহার পাদদেশে উপস্থিত করা হয়।

গভীর নিশিথ। পথে নামলেন শ্রেষ্ঠ রসুল এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সহচর। হজরত আবু বকর আশংকা ও উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়লেন। পথ চলতে লাগলেন কখনো বামে, কখনো দক্ষিণে, আবার কখনো সামনে ও পশ্চাতে। রসুল স. বললেন, আবু বকর! এমন করছো কেনো? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কোন্ দিক থেকে দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করে বসবে কে জানে। আমি তো তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে চাই।

যখন সওর পর্বতের গুহামুখে তাঁরা উপস্থিত হলেন তখন রাত্রিশেষ। প্রায়ন্ধকার প্রত্যুষের বুকে অস্পষ্ট আলো উঁকি দিচ্ছে। হজরত আবু বকর বললেন, পবিত্রতম সত্তার শপথ! আপনি আগে প্রবেশ করবেন না। আমি আগে প্রবেশ করে দেখি ক্ষতিকর কিছু সেখানে আছে কিনা। এই বলে তিনি গুহায় প্রবেশ করলেন। দেখতে পেলেন গুহাগাত্রে অসংখ্য ছিদ্র। তিনি কাপড় ছিঁড়ে ছোট ছোট টুকরো করে সেগুলো দিয়ে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিলেন। কাপড়ের অভাবে একটি ছিদ্র বন্ধ করা গেলো না। তিনি ছিদ্রটিতে তাঁর পায়ের গোড়ালি চেপে ধরলেন। রসুলুল্লাহ স. ভেতরে প্রবেশ করলেন। হজরত আবু বকর দেখলেন, খালি পায়ে পথ চলার কারণে রসুল স. এর

পবিত্র পদযুগল রক্তাক্ত হয়েছে। তিনি হজরত আবু বকরের উরুদেশে মস্তক স্থাপন করে শুয়ে পড়লেন। একটু পরে তন্দ্রাভিভূত হলেন।

ওই গর্তটিতে ছিলো একটি সাপ। সাপটি সেখান থেকে বের হবার চেষ্টা করলো। বের হতে না পেরে হজরত আবু বকরের পায়ে দংশন করলো। বিষের যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করলেন তিনি। কিন্তু যন্ত্রণার আতিশয্যে চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়লো রসুলুল্লাহ স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলে। তিনি স. জাগ্রত হলেন। রোদনের কারণ জিজ্ঞেস করতেই হজরত আবু বকর বললেন, সাপ দংশন করেছে। আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। তিনি স. তাঁর পবিত্র মুখের থুথু ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। যন্ত্রণার উপশম হলো সঙ্গে সঙ্গে।

আল্লাহ্তায়ালার কী অপার মহিমা! রসুলুল্লাহ স. ও হজরত আবু বকর দেখলেন, গুহামুখে সৃষ্টি হলো একটি বাবলা গাছ। ডালপালা মেলে দিয়ে গাছটি তাঁদেরকে একই সঙ্গে দিলো ছায়া ও আড়াল। হঠাৎ ছুটে এলো এক জোড়া বন্য কবুতর। গাছটির ডালে বাসা বাঁধলো তারা। কোত্থেকে যেনো একটা মাকড়সাও এলো। জাল বিস্তার করলো গুহামুখে।

ওদিকে কাফেরেরা যখন রসুলুল্লাহ স.কে তাঁর বাড়িতে পেলো না, তখন ক্ষিপ্ত-ক্ষুব্ধ হলো খুব। বুঝলো, তিনি স. নিশ্চয়ই মদীনায় মুসলমানদের সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছেন। তাঁকে ধরবার জন্য তারা বিভিন্ন দিকে ছুটে গেলো। পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে উঠে গেলো পাহাড়ের চুড়ায়। গুহাটির মুখের কাছে পৌঁছলো। সেখানে কবুতরের বাসা ও মাকড়সার জাল দেখতে পেয়ে হতাশ হলো।

গুহার ভিতর থেকে হজরত আবু বকর দেখলেন, তাদের সাথে একজন পদচিহ্নবিশারদ রয়েছে। সে বললো, তোমাদের শিকার এ গুহা ছাড়া অন্য কোথাও প্রবেশ করেনি।

হজরত আবু বকর একথা শুনে রসুলুল্লাহ স. এর সমূহ বিপদের কথা ভেবে কেঁদে ফেললেন। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শত্রুরা তাদের পায়ের দিকে ভালো করে তাকালেই তো আমাদেরকে দেখতে পাবে। আমরা তাদেরকে প্রতিহত করবো কী করে। আমরা তো মাত্র দু'জন। রসুলুল্লাহ স. বললেন, ভয় পেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। একথা শুনে হজরত আবু বকর শংকামুক্ত হলেন। প্রশান্তির মেঘপুঞ্জ ঘিরে ফেললো তাঁর হৃদয়াকাশকে।

শত্রুদের কেউ কেউ বললো গুহামধ্যে প্রবেশ করো। উমাইয়া ইবনে খালফ বললো, কী দরকার। ভেতরে কেউ ঢুকলে মাকড়সার জাল আর কবুতরের ডিম কী আর অক্ষত থাকতো? এই বলে সে বস্ত্র উম্মোচন করে গুহামুখে প্রস্রাব করে দিলো।

হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ওতো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে। রসুল স. বললেন, নিশ্চয় নয়। দেখতে পেলে সে কি এভাবে তার বস্ত্র উম্মোচন করতো।

শত্রুরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেলো। ওই সংকীর্ণ গুহায় তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত করলেন তাঁরা দু'জনে। হজরত আবু বকরের বালক পুত্র আবদুল্লাহ তাঁদের সাথে রাত্রি যাপন করতেন। সকাল হওয়ার আগেই চলে যেতেন বাড়িতে। কুরায়েশ কাফেরদের আলাপ আলোচনা শুনতেন। রাতে সেগুলো গুহাবাসীদ্বয়কে জানাতেন। হজরত আবু বকরের মুক্ত ক্রীতদাস আমের ইবনে ফুহাইরা সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রান্তরে ছাগল চরাতেন। অন্ধকার কিছুটা গাঢ় হলে ছাগলের দুধ দোহন করে তাঁদেরকে দুগ্ধ সরবরাহ করতেন। হজরত আসমা রাতে নিয়ে আসতেন খাদ্য।

তিন দিন পরে যখন শত্রুরা নিরাশ ও ম্রিয়মান হয়ে গেলো, তখন তাঁরা স্থির করলেন, রাতের অন্ধকারেই যাত্রা শুরু করবেন। নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্বস্ত আবদুল্লাহ বিন আরীকাত উট দুটো এনে দিলো। হজরত আসমা এনে দিলেন কিছুটা পাথেয়। গুহাভ্যন্তর থেকে বের হয়ে দু'জনেই উষ্ট্রারোহী হলেন।

হজরত আবু বকর আমেরকে তাঁর নিজের উটে উঠিয়ে নিলেন। আর কাসওয়ার সম্মুখভাগে পথ দেখিয়ে হেঁটে চললো আরদ। দিকচক্রবাল বিস্তৃত মরুভূমির বালুকাপথের উপর দিয়ে মদীনার দিকে এগিয়ে চললো চারজনের ক্ষুদ্র কাফেলা।

ভোর হলো। নির্বাক নীল নির্মম মহাকাশ আলোকিত হয়ে গেলো পুরোপুরি। মরুপথ তপ্ত হলো, তপ্ততর হলো। বামে দক্ষিণে সম্মুখভাগে কোথাও কোনো জনবসতির চিহ্ন দেখা গেলো না। হঠাৎ ছায়াহীন মরু পথের এক স্থানে দেখা গেলো একটি প্রকাণ্ড পাথর। কাফেলা সেখানে থামলো। হজরত আবু বকর প্রস্তরখণ্ডটির একপাশের ছায়ায় রসুল স. এর জন্য বিশ্রামস্থল রচনা করলেন। একটি কম্বল বিছিয়ে দিয়ে বললেন, হে

আল্লাহ্‌র রসুল! এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। রসুল স. সেখানে শয়ন করা মাত্র নিদ্রাভিভূত হলেন। একটি ছাগলের রাখাল তার ছাগপাল নিয়ে পথ অতিক্রম করছিলো। হজরত আবু বকর তাকে থামতে বললেন। অনুমতি নিয়ে তার একটি ছাগলের দুধ দোহন করলেন। রসুল স. এর নিদ্রাভঙ্গ হলে ওই দুধটুকু কিছুটা পানি মিশিয়ে তাঁকে পান করতে দিলেন। পরে নিজেও পান করলেন।

দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলো। অপরাহ্ন সমাগত প্রায়। আগুনঝরা সূর্য সংযম প্রদর্শন করলো কিছুটা। কাফেলা আবার যাত্রা শুরু করলো।

পরদিন যেখানে যাত্রাবিরতি করতে হলো, সেখানে ছিলো একটি কুটির। কুটিরে বাস করতেন অতিথিপরায়ণা উম্মে মাবাদ এবং তাঁর স্বামী। পরিশ্রান্ত পথিকদেরকে তিনি পানাহার করাতে ভালোবাসতেন। তিনি আগন্তুকদেরকে চিনতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। হজরত আবু বকর তাঁর কাছে কিছু গোশত ও দুধ কিনতে চাইলেন। উম্মে মাবাদ বললেন, আজতো আমার ঘরে কিছুই নেই। আমার স্বামীও বাড়ি নেই। রসুলুল্লাহ স. দেখলেন, উম্মে মাবাদের সকল ছাগল কৃশকায়। একটি ছাগল দেখিয়ে তিনি স. বললেন, এটি কি দুগ্ধবতী? উম্মে মাবাদ বললেন, না। এটাতো সবচেয়ে কৃশ। অপ্রাপ্তবয়স্কা। চরেও খেতে পারে না। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। রসুলুল্লাহ স. ছাগীটির পালানে তাঁর পবিত্র হস্ত স্পর্শ করে বললেন, আল্লাহ্‌! বকরিটিতে বরকত দাও। এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাগীটির পালান দুধে ভরে গেলো। তিনি দোহন করলেন। কাফেলার সকলকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুধ পান করালেন। নিজে পান করলেন সকলের শেষে। বললেন, সাকিকে সকলের শেষে পান করতে হয়।

দশ

কুরায়েশ গোত্রপতিরা চারিদিকে প্রচার করে দিলো, যে ব্যক্তি মোহাম্মদ অথবা আবু বকরকে গ্রেপ্তার অথবা হত্যা করতে পারবে, তাকে এক শত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের লোভে লোকেরা দিকে দিকে ছুটে গেলো।

কিন্তু তাঁদের সন্ধান কেউ পেলো না। সন্ধান পেলো এক বেদুইন সরদার। নাম তার সোরাকা। সে খুঁজতে খুঁজতে এক স্থানে দেখতে পেলো সমুদ্রোপকুলের পথ ধরে চার জনের একটি ছোট কাফেলা এগিয়ে চলেছে। দূর থেকে সে রসুলুল্লাহ স. কে চিনতেও পারলো। খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে নিকটবর্তী হলো। কিন্তু অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করতেই তার ঘোড়া হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

রসুলুল্লাহ স. নিরুদ্বিগ্ন মনে কোরআন পাঠ করছিলেন। কিন্তু হজরত আবু বকর ভীত ও শংকিত হলেন। কেঁদে ফেললেন তিনি। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই তো সোরাকা। সে তো আমাদেরকে ধরেই ফেললো। রসুল স. বললেন, কখনো নয়। সোরাকা উচ্চকণ্ঠে বললো, মোহাম্মদ! আজ আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? তিনি স. প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্। তিনি স. দোয়া করলেন, আল্লাহ্! আমাদেরকে রক্ষা করো। হজরত জিব্রাইল আ. আবির্ভূত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র আদেশক্রমে আমি বলছি, জমিনকে আপনার নির্দেশানুগত করে দেওয়া হয়েছে। আপনি তাকে আদেশ করুন। রসুলুল্লাহ স. বললেন, হে মৃত্তিকা! ওকে ধরো। সঙ্গে সঙ্গে সোরাকার ঘোড়ার সামনের দুই পা বুক পর্যন্ত মাটিতে প্রোথিত হলো। সোরাকাও মাটিতে পড়ে গেলো।

ভীত হলো সে। বললো, আমার জন্য ও আমার ঘোড়ার জন্য দোয়া করুন। আমি আর অগ্রসর হবো না। তিনি স. দোয়া করলেন। ঘোড়াটি চেষ্টা করে তার পা দুটো মাটি থেকে উঠিয়ে নিতে পারলো। কিন্তু ওই গর্ত থেকে বের হলো ধুম্রপুঞ্জ। আচ্ছন্ন করে ফেললো আকাশভাগকে। সোরাকা ভয় পেলো। অনুতপ্ত হৃদয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে রসুলুল্লাহ স.কে বললো, দয়া করে আমার মালসামগ্রীসমূহ গ্রহণ করুন। তিনি স. বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি তোমার মালসামগ্রী গ্রহণ করবো না। সে বললো, আমি বিশ্বাস করি, শীঘ্রই আপনার ধর্ম বিজয়ী হবে। সকল মানুষ আপনার আনুগত্য করবে। সেদিন আপনি আমাকে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করবেন— এইমর্মে আপনি আমাকে একটি নির্ভয়পত্র লিখে দিন। রসুলুল্লাহ স. হজরত আবু বকরের ক্রীতদাস আমেরকে একটি চর্মখণ্ডে নির্ভয়পত্র লিখে দিতে বললেন।

সোরাকা ফিরে গেলো। কাফেলা এগিয়ে চললো— বিশ্রাম-যাত্রা, যাত্রা-বিশ্রাম এভাবে। ঘন কালো নিশিথ আর চক্ষু ধাঁধানো দিবস পালাক্রমে বিদায় জানাতে লাগলো তাঁদেরকে। এ পথে হজরত আবু বকর বহু বার সিরিয়া যাতায়াত করেছিলেন। তাই পথটি তাঁর চেনা। আর এই চেনা পথে কখনো কখনো তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তারা জিজ্ঞেস করলো, তোমার সঙ্গীটি কে? তিনি জবাব দিলেন, পথপ্রদর্শক।

একদিন দেখা হলো হজরত যোবায়েরের সাথে। তিনি সিরিয়া থেকে পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ স.কে হাদিয়া হিসাবে প্রদান করলেন কয়েক প্রস্ত মূল্যবান শাদা বস্ত্র।

এগার

বারোই রবিউল আউয়াল সোমবার রসুলুল্লাহ স. ও আবু বকর নিরাপদে মদীনায় পৌঁছলেন। বিপুলসংখ্যক মুসলিম জনতা শহরের উপকণ্ঠে এগিয়ে গিয়ে তাঁদেরক স্বাগত জানালেন। তাঁদের ভালোবাসার সীমাহীন আবেগ উচ্ছ্বাসে নিমজ্জিত হলেন নবীয়ে আখেরুজ্জামান ও তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় সহচর হজরত আবু বকর। জনতার অনেকেই রসুলুল্লাহ স.কে আগে দেখেননি। তাই অনেকে হজরত আবু বকরকেই রসুলুল্লাহ মনে করে বসলেন। হজরত আবু বকর একথা বুঝতে পেরে তাঁদের ভুল ভাঙালেন সুন্দর একটি কৌশল অবলম্বন করে।

একটি খেজুর গাছের নিচে উপবেশন করেছিলেন রসুলুল্লাহ স.। খেজুর পাতার ফাঁক দিয়ে তাঁর পবিত্র অবয়বে রৌদ্র পতিত হচ্ছিলো। তিনি নিজের চাদর তাঁর মাথার উপরে মেলে ধরে রৌদ্র প্রতিহত করলেন। তখন সকলেই বুঝতে পারলো আল্লাহ্‌র রসুল কে এবং কে তাঁর খাদেম।

কোবা পল্লীতে কয়েকদিন অবস্থান করলেন তিনি স.। তারপর অগ্রসর হলেন শহরাভ্যন্তরের দিকে। তাঁকে অতিথিরূপে পেতে চাইলেন অনেকে। অনেকে আবেদন নিবেদনও করলেন। তিনি স. বললেন, আমার কাসওয়া

আল্লাহ্‌র নির্দেশনিয়ন্ত্রিত। সে যে স্থানে থামবে, সে স্থানই হবে আমার আবাসস্থল। সকলে কাসওয়ার পথ ছেড়ে দিলো। চলতে চলতে কাসওয়া একস্থানে বসে পড়লো। সেখান থেকে আর একটুও অগ্রসর হলো না। রসুলুল্লাহ স. সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করবেন বলে ঘোষণা দিলেন। ওই স্থানের মালিক ছিলো দু'জন এতিম বালক। তিনি তাঁদেরকে ডেকে পাঠালেন। মসজিদের কথা শুনে তারা বিনামূল্যে ভূমিদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। তিনি স. তাতে সম্মত হলেন না। হজরত মুয়াজ একাই জমির মূল্য পরিশোধ করতে চাইলেন। তিনি স. তাতেও সম্মতি দিলেন না। জমির মূল্য পরিশোধ করার নির্দেশ দিলেন হজরত আবু বকরকে। তিনি প্রসন্নচিত্তে নির্দেশ পালন করলেন।

মসজিদ নির্মাণ শেষে মসজিদের দেয়াল ঘেষে তৈরী হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। কিছুদিন পরে রসুলুল্লাহর পরিবার-পরিজন এলে এ প্রকোষ্ঠগুলোর একটিতে তুললেন উম্মতজননী হজরত সাওদা রা.কে। আর হজরত আবু বকরের পরিবার-পরিজন উঠলেন অন্যত্র।

তখন মদীনার নাম ছিলো ইয়াস্‌রেব। 'ইয়াস্‌রেব' অর্থ অশান্তির স্থান। সেখানে রোগব্যাধি বালা-মুসিবত লেগেই থাকতো। অনেক মুহাজির জ্বরাক্রান্ত হলেন। হজরত আবু বকর এমন জ্বরে পড়লেন যে, জীবনের আশাই ছেড়ে দিলেন। হজরত আয়েশা তখনও বালিকা। পিতৃগৃহেই অবস্থান করছিলেন। তিনিও জ্বরজর্জরিত হলেন। বেশ কিছুদিন পরে রসুলুল্লাহর দোয়ায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন পিতা-পুত্রী।

রসুলুল্লাহ স. দোয়া করলেন, হে আমাদের প্রভুপালক! মক্কাকে যে রূপ আমাদেরকে প্রিয় করে দিয়েছো, মদীনাকেও আমাদের সেরূপ অথবা ততোধিক প্রিয় করে দাও।

সাত মাস কেটে গেলো এভাবে। একদিন হজরত আবু বকর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার পত্নীকে ঘরে তুলে নিচ্ছেন না কেনো? রসুলুল্লাহ স. বললেন, মোহর পরিশোধ করার মতো অর্থ হাতে নেই। হজরত আবু বকর বললেন, অনুগ্রহ করে আমার অর্থ গ্রহণ করুন। রসুলুল্লাহ স. জানেন, তিনি স. আবু বকরের প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়। তাই তিনি অমত করলেন না। পাঁচ শত দিরহাম নিয়ে মোহর পারিশোধ করলেন। ঘরে নিয়ে এলেন তাঁর প্রিয়তমাকে— আবু বকর সিদ্দিক তনয়া উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকাকে।

বার

মদীনা থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে সিরিয়া যাওয়ার পথে একটি দুর্গম এলাকার নাম বদর। ওই স্থানেই হিজরী দ্বিতীয় বৎসরের ১৭ই রমজানে অনুষ্ঠিত হয় ইসলাম ও কুফরের প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ। মক্কার মুশরিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিলো প্রায় এক হাজার। আর মুসলিম বাহিনীতে ছিলেন তিনশত তের জন। তবু আল্লাহ্পাক মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করেন।

রসুলুল্লাহ স. তাঁর বাহিনী নিয়ে বদর প্রান্তরে পৌঁছলেন। হজরত আবু বকর তাঁর জন্য পশমী চাদর দিয়ে একটি তাঁবু নির্মাণ করলেন। তাঁবুটি খাটিয়ে দিলেন একটি পাহাড়ের উপর। তিনি স. ওই তাঁবুর মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করলেন। হজরত আবু বকর খোলা তলোয়ার হাতে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলেন।

রসুলুল্লাহ স. সেজদায় পতিত হলেন। প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপালক! কুরায়েশদের বিশাল বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তোমার রসুলকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে এসেছে। তুমিতো আমাকে বিজয়ী করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো। হে আমার আল্লাহ্! এই ক্ষুদ্র মুজাহিদ বাহিনী যদি আজ এই প্রান্তরে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়, তবে তো পৃথিবীতে তোমার ইবাদত আর হবে না।

হজরত আবু বকর রসুলুল্লাহ স. এর এমতো আহাজারি সহ্য করতে পারছিলেন না। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অন্তরে যুদ্ধজয়ের এলহাম করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করে তাঁর চাদরের প্রান্তদেশে স্পর্শ করে প্রেমময় সান্ত্বনার স্বরে বললেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! মস্তক উত্তোলন করুন। আপনার প্রার্থনা কবুল করা হয়েছে। দয়া করে ক্ষান্ত হোন। শান্ত হোন।

রসুলুল্লাহ স. তাঁবু থেকে বের হয়ে এলেন। বাহিনীর দক্ষিণ ভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন হজরত আবু বকরের উপর। ওই বাহিনীতে ছিলেন

হজরত মিকাইল আ. আর বাম বাহিনীর অধিনায়ক করলেন হজরত আলীকে। ওই বাহিনীতে ছিলেন হজরত ইসরাফিল আ.। এ সম্পর্কে হজরত আলী বলেছেন, আমি কূপ থেকে পানি ওঠাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঝড় উঠলো। ওরকম ধূলিঝড় আমি আগে কখনো দেখিনি। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ঝড়টি থেমে গেলো। আর একটি ঝড় উঠলো হঠাৎ। সেটিও থেমে গেলো কিছুদূর এগোনোর পর। দেখলাম, প্রথম ঝড়ের অন্তরালে আবির্ভূত হয়েছেন হজরত মিকাইল আ.। তিনি এক হাজার ফেরেশতা নিয়ে দক্ষিণ বাহুর সঙ্গে মিলিত হলেন। ওই বাহুর অধিনায়ক ছিলেন হজরত আবু বকর। আর দ্বিতীয় ঝড়ের ভিতর থেকে আরও এক হাজার ফেরেশতা সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে এলেন হজরত ইসরাফিল আ.। তিনি যোগ দিলেন আমার দায়িত্বভূত বাম বাহিনীতে। এরপর আর একটি ধূলিঝড়ের সঙ্গে হাজার সৈন্য নিয়ে এলেন হজরত জিব্‌রাইল আ.। তিনিও তাঁর সেনাদেরকে নিয়ে মিশে গেলেন মুজাহিদ বাহিনীতে। —এই সত্য মিথ্যা নির্ধারিত যুদ্ধে আবু বকর ছিলেন অকুতোভয়। প্রবল বীরত্বের সঙ্গে রসুলুল্লাহ স. এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে চলেছিলেন তিনি। তাঁর তীক্ষ্ণ-তীব্র আক্রমণভঙ্গি দেখে কোনো মুশরিক সেনা তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস পায়নি।

বহুসংখ্যক কাফের নিহত হলো। বন্দী হলো সত্তর জন। রসুলুল্লাহ স. বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধবন্দীদেরকে নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। তাদেরকে কী করা হবে তাই নিয়ে পরামর্শসভা বসলো। হজরত ওমর ও কতিপয় সাহাবী তাদেরকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। কেউ কেউ বললেন, ওদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক। হজরত আবু বকর তাদের প্রতি মমত্ব পোষণ করলেন। বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! এরা তো আপনার স্বজন, আপনারই জ্ঞাতিগোষ্ঠীভূত। অর্থদণ্ড আরোপ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেই তো ভালো হয়। কে একথা বলতে পারে যে, ভবিষ্যতে এদের বোধোদয় ঘটবে না।

রসুলুল্লাহ স. হজরত আবু বকরের পরামর্শকেই সর্বোত্তম বলে মেনে নিলেন। নির্দেশ দিলেন অর্থদণ্ড আদায়ের শর্তে মুক্তির।

পরের বছর মক্কার মুশরিকেরা বদরযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মদীনার দিকে ছুটে এলো। অবস্থান গ্রহণ করলো মদীনার উপকণ্ঠে উহুদ পাহাড়ের পাশে। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো তিন হাজারেরও বেশী।

মুসলিমবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সাতশত। এই যুদ্ধে রসুলুল্লাহ স. নিজে সেনাব্যূহ রচনা করলেন। আর হজরত আবু বকর হলেন তাঁর সার্বক্ষণিক প্রহরী।

প্রথমেই মুজাহিদ বাহিনী বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুশরিকদের উপর। তারা এদিক ওদিক ছুটে পালালো। শত্রুরা পরাজিত হয়েছে মনে করে সবাই গনিমত হিসেবে তাদের পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহে লিপ্ত হলো। সংকীর্ণ এক গিরিপথে পাহারারত পঞ্চাশজন তীরান্দাজও নিশ্চিন্ত মনে গনিমত সংগ্রহ করতে গেলো। ঠিক তখনই ঘুরে দাঁড়ালো মুশরিকেরা। গিরিপথ বেয়ে ঢুকে পড়লো মুসলিমবাহিনীর অভ্যন্তরভাগে। মুসলিমবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। আক্রমণ হলো বিচ্ছিন্নভাবে। অনেকেই শহীদ হয়ে গেলেন।

মুশরিকেরা রসুলুল্লাহ স. এর কাছে এসে পড়লো। এক দুরাচার তলোয়ারের আঘাত হানলো তাঁর উপরে। তাঁর লৌহশিরস্ত্রাণ ভেদ করে আঘাত লাগলো মস্তকে। তিনি স. রক্তরঞ্জিত হলেন। ভেঙে গেলো সম্মুখভাগের একটি দাঁত।

কিছু বুঝে উঠার আগেই হজরত আবু বকর দেখলেন, রসুলুল্লাহ স. অরক্ষিত। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে চলে এলেন। রক্তরঞ্জিত রসুলকে দ্বিতীয় আক্রমণের সুযোগ দিলেন না। তিনি বলেছেন, উহুদ প্রান্তরে মুসলমানেরা পুনঃআক্রান্ত হলো। অতর্কিতে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। পরক্ষণে সচকিত হলো সকলে। রসুলুল্লাহ স. এর কাছে দ্রুত এসে সমবেত হলো। আমি উপস্থিত হলাম সকলের আগে। আবু উবায়দা তো আমাকেই রসুলুল্লাহ বলে জড়িয়ে ধরলো।

মুশরিকবাহিনী পশ্চাদপসরণ করলো। ভাবলো, তাদেরই বিজয় হয়েছে। রসুলুল্লাহ এবং তাঁর প্রধান সহচরেরা নিহত হয়েছেন। তাদের অধিনায়ক আবু সুফিয়ান গর্বভরে উচ্চস্বরে ডেকে বললো, মোহাম্মদ আছো? রসুল স. নিরব রইলেন। ইশারায় সহচরগণকে চুপ থাকতে বললেন। সে আবার উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বললো, আবু বকর আছো? সাড়া না পেয়ে পুনরায় ডাকলো, ওমর আছো। এবারও সাড়া না পেয়ে সে বললো, নেই। সব কটাই নিহত হয়েছে। থাকলে সাড়া পাওয়া যেতো।

হজরত ওমর আর চুপ থাকতে পারলেন না। চিৎকার করে বললেন, ওরে মিথ্যুক! তুই তো আল্লাহর দুশমন। তোকে পরাস্ত করার জন্য আল্লাহ্ই তাঁদের সবাইকে জীবিত রেখেছেন। আবু সুফিয়ান জবাব দিলো, ঠিক আছে, আগামী বৎসর আবার যুদ্ধের ময়দানে দেখা হবে।

রসুলুল্লাহ স. সাহাবীগণকে বললেন, ওদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। কে কে যেতে চাও? সর্বপ্রথম হজরত আবু বকর এগিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন আরও সত্তর জন।

হিজরী পঞ্চম বৎসরে অনুষ্ঠিত হলো খন্দক যুদ্ধ। খন্দক অর্থ পরিখা। হজরত সালমান ফারসির পরামর্শ মেনে মদীনার প্রবেশপথসমূহে পরিখা খনন করে মুশরিকবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা করলেন তিনি স.। এই যুদ্ধেও হজরত আবু বকর তাঁর বীরত্ব প্রকাশ করলেন। রসুলুল্লাহ স. তাঁকে পরিখার একটি দিকের সুরক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে এমন অতন্দ্র প্রতিহতকারী হয়ে রইলেন যে, মুশরিকেরা সেদিকে আক্রমণ করার সাহস পেলো না।

তেরো

পঞ্চম হিজরী সনেই আর একটি মর্মবিদারক ঘটনার সূত্রপাত হলো। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. নিজে ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন এভাবে— মহানবী স. সংবাদ পেলেন, মুরাইশি জনপদের পার্শ্ববর্তী লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধেযুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তাদেরকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ স. নিজেই সাহাবীগণকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও তার অনুরক্তদের নিয়ে গনিমত লাভের আশায় সহযাত্রী হলো। ফেরার পথে এক স্থানে রাত্রিযাপনের জন্য থামতে হলো। রাতের শেষভাগে সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন আমি প্রকৃতির ডাকে বাইরে গেলাম। ফিরে এসে দেখলাম, আমার গলার হারটি নেই। হার খুঁজতে খুঁজতে কিছুটা দূরে গেলাম। হারটি না পেয়ে ফিরে এসে দেখলাম, কাফেলা চলে গিয়েছে। সফরের নিয়ম ছিলো, আমি হাওদাতে

উঠে যেতাম। চারজন লোক হাওদাটি তুলে পিঠের উপরে বসিয়ে দিতো। বুঝলাম, আমি যে হাওদার মধ্যে নেই, লোকেরা তা বুঝতে পারেনি। শূন্য হাওদাটি উঠিয়ে দিয়েছে।

ভোরের আলো ফুটে উঠলো। আমি হারটি খুঁজে পেলাম। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে বসে রইলাম। ভাবলাম, সামনের বিরতিস্থলে গিয়ে সকলে আমার অনুপস্থিতির কথা বুঝতে পারবে। তখন খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়বে। কখন যেনো ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন' আওয়াজ শুনে। দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আস্ সুলামী। তাঁর দায়িত্ব ছিলো কাফেলার পিছনে পিছনে আসা। কারও কোনো জিনিসপত্র ছাড়া পড়লো কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করা। তিনি বিস্মিত হলেন। বললেন, আম্মাজান! আপনি! আর কোনো কথা না বলে তাঁর উটটিকে এনে আমার সামনে বসালেন। আমি উটের পিঠে উঠে বসলাম। তিনি উটটির লাগাম ধরে আগে আগে চললেন। দুপুরের কিছু আগে আমরা কাফেলার কাছে উপস্থিত হতে পারলাম। আমাকে উট থেকে নামতে দেখলো অনেকে। মুনাফিকশ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে বলে উঠলো, আল্লাহ্‌র কসম! এই নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।

মদীনায় পৌঁছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম একমাস ধরে। ওদিকে সারা শহরে যে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি তা জানতেও পারলাম না। শুধু লক্ষ্য করলাম, রসুলুল্লাহ আমার সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলেন না। অন্যকে জিজ্ঞেস করেন, ও কেমন আছে। আমি অভিমানাহত হলাম। তাঁর স. অনুমতি নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলাম।

প্রায় একমাস ধরে মদীনার আকাশ বাতাস মিথ্যা অপবাদের কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। রসুলুল্লাহ অবর্ণনীয় মানসযন্ত্রণায় কষ্ট পেতে লাগলেন। আমার পিতা-মাতার জীবন হয়ে পড়লো দুর্বিষহ। আশংকা ও উদ্বেগের আগুনে অহরহ দগ্ধ হতে লাগলেন তাঁরা।

রসুলুল্লাহ আমার কাছে এলেন দীর্ঘ এক মাস গত হওয়ার পর। পাশে বসলেন। একটু পরে উপস্থিত হলেন আমার পিতা-মাতা। তিনি স. বললেন, আয়েশা শুনেছো তো সবকিছু। তুমি যদি নিষ্পাপ হও, তাহলে আশা করি আল্লাহ্ সে কথা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিবেন। আরও জেনে

নাও, অপরাধীদের জন্যও তাঁর দয়া ও ক্ষমার দরজা সতত উন্মুক্ত। তাওবাকারীকেও তিনি ভালোবাসেন। একথা শুনে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেলো। পিতাকে বললাম, রসুলুল্লাহর কথার জবাব দিন। তিনি বললেন, কী বলবো বুঝতে পারছি না। মাকে বললাম, আপনি কিছু বলুন। তিনিও অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি ক্ষোভে-দুঃখে-অভিমানে জর্জরিত হয়ে আমার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলাম।

ক্ষোভে-দুঃখে কাতর আমার পিতা ক্রোধান্বিত হলেন। ক্রোধের লক্ষ্যস্থল করলেন আমাকেই। বললেন, আজ কলংকের কালিমায় আমার গোটা পরিবার কলংকক্লিষ্ট। এরকম কলংক আরবের কোনো পরিবারে পড়েনি। অথচ মূর্খতার যুগেও আমরা ছিলাম কলংকমুক্ত।

আমার স্থির বিশ্বাস ছিলো, নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর রসুল স.কে আমার নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে জানাবেন। পেলাম আশার অতীত— আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমার নিষ্পাপ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করলেন। এভাবে আল্লাহ্র অবতারিত প্রত্যাদেশের মাধ্যমে (সূরা নূর) কলংকমুক্ত হতে পারলাম আমি। আলহামদুলিল্লাহ্।

চৌদ্দ

রসুলুল্লাহ স. স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে মক্কা শরীফে গেলেন। কাবাগৃহের চাবি তাঁর হাতে দেওয়া হলো। দেখলেন, সাহাবীগণ কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডন করেছেন। আবার কেউ কেউ করেছেন কেশকর্তন।

পরদিন তিনি স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে দিলেন। সবাই মহা আনন্দিত হলেন। সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসের সোমবারে যাত্রা করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হলো। নির্দিষ্ট দিনে সবাই সমবেত হলেন। মোট সংখ্যা দাঁড়ালো চৌদ্দশ'র কিছু উপরে। অনেকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হতে চাইলেন। কিন্তু তিনি স. নিষেধ করলেন।

সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যুদ্ধ উদ্দেশ্যে নয়। উদ্দেশ্য কেবল জিয়ারত ও ওমরা পালন। সুতরাং সাথে নিতে হবে কোরবানীর পশু এবং কোষাবদ্ধ অসি।

কাফেলা চলতে লাগলো। সকলের হৃদয়ে ও মুখে কেবলই আল্লাহ্‌র জিকির- তালবিয়া ধ্বনি। মক্কার নিকটে হুদাইবিয়া পৌঁছে তাঁরা বাধাগ্রস্ত হলেন। কুরায়েশ নেতৃবর্গ বলে পাঠালো, তারা রসুলুল্লাহ স. কে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। মুসলিমবাহিনী উত্তেজিত হলো। শেষে সন্ধিপ্রস্তাব উত্থাপন করা হলো। উভয় পক্ষই তা মেনে নিলো। সন্ধির শর্তসমূহ এমনভাবে মুসলমানদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হলো যে, তাঁরা অপমানিত বোধ করলেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ স. বর্তমান ও ভবিষ্যতের শান্তির স্বার্থে তা মেনে নিলেন। গোত্রপতি কুদায়েল কুরায়েশদের মুখপাত্র হিসেবে রসুলুল্লাহ স. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। বললো, মোহাম্মদ! মনে করুন আপনি বিজয়ী হলেন। নির্মূল করলেন আপনার জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে। কিন্তু পৃথিবীতে এরকম স্বগোত্র নির্মূলকারী কেউ কি জন্মেছে? আর যদি যুদ্ধ করাই আপনার অভিলাষ হয়, তবে তো আপনাকে যথাপ্রস্তুতি নিয়ে আসতে হবে। আপনার সঙ্গী-সাথীরা দুর্বল ও ভীরু। তারা তো পালাবে। হজরত আবু বকর রাগান্বিত হলেন। ধমক দিয়ে বললেন, ভাগ এখান থেকে। কী ভেবেছিস তুই। আমরা আল্লাহ্‌র রসুলকে ছেড়ে পালাবো?

ওরওয়া অপ্রস্তুত হলো। বললো, লোকটি কে? তিনি স. বললেন, আবু বকর। ওরওয়া বললো, ওর গালির জবাব আমি দিতাম। কিন্তু আমার একটি উপকার করেছিলো সে, তার বদলা আমি এখনো দিতে পারিনি।

সন্ধিচুক্তিটি বাহ্যতঃ অপমানকর হলেও আল্লাহ্‌ এই চুক্তিবদ্ধতাকে বিজয় বলে আখ্যা দিলেন। প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করলেন— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে নিশ্চিত বিজয় দান করলাম—

সন্ধির শর্তগুলো ছিলো এরকম—

১. মুসলমানেরা এ বছর ফিরে চলে যাবে। ২. আগামী বছর এসে তারা ওমরা করতে পারবে, কিন্তু মক্কায় অবস্থান করতে পারবে মাত্র তিনদিন। ৩. কোষাবদ্ধ তরবারী ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র আনতে পারবে না । ৪. এখানে যে কয়জন মুসলিম মক্কায় বাস করছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। ৫. মক্কার কোনো মুসলমান অথবা অমুসলমান মদীনায় গেলে তাকে

ফেরত পাঠাতে হবে। ৬. আরব গোত্রগুলো মুসলমান ও কুরায়েশ যে কোনো পক্ষের সাথে স্বাধীনভাবে সম্পর্ক রাখতে পারবে।

সাহাবীগণ মনোক্ষুণ্ন হলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসুলের কথা নির্বিবাদে মেনে নিলেন। নিরবতা ভঙ্গ করলেন কেবল হজরত ওমর। তিনি প্রথমে আবু বকরের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, তিনি কি আল্লাহ্‌র রসুল নন? হজরত আবু বকর বললেন, নিশ্চয়ই। হজরত ওমর বললেন, আমরা কি মুসলমান নই? তিনি বললেন, অবশ্যই। হজরত ওমর পুনঃপ্রশ্ন করলেন, তারা কি মুশরিক নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, তবে কেনো আমরা তাদের কাছে অবনত হবো? হজরত আবু বকর বললেন, তবে শোনো ওমর। তিনি তো আল্লাহ্‌র রসুল। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও প্রত্যাদেশবাহী। তাঁর পূর্ণ অনুগত থাকো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহ্‌র বাণীবাহক।

হজরত ওমর নির্বাক হয়ে গেলেন, কিন্তু শান্ত হলেন না। উপস্থিত হলেন রসুলুল্লাহ স. এর মহান সাহচর্যে। অনুযোগভরা কণ্ঠে বললেন, আপনি কি আল্লাহ্‌র রসুল নন? তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই। ওমর প্রশ্ন করলেন, আমরা কি মুসলমান নই? তিনি স. বললেন, অবশ্যই। ওমর জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি মুশরিক নয়? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, আমাদের ধর্ম সত্য এবং তাদের ধর্ম কি মিথ্যা নয়? তিনি স. জবাব দিলেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, তবে কেনো আমরা তাদেরকে বড় মনে করবো? তিনি স. বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌র নির্দেশানুগত, আমি তো তাঁর রসুল। নিশ্চয় তিনি আমাকে অনিষ্টমুক্ত রাখবেন। ওমর বললেন, আপনি ওমরা করবেন, একথা কি বলেননি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। বলেছি। কিন্তু এবারেই যে করবো, তেমন কথা তো বলিনি।

হজরত ওমর এবার শান্ত হলেন। বিস্মিত হলেন একথা ভেবে যে, আবু বকরের প্রজ্ঞা ও মন-মানসিকতা যে অবিকল রসুলুল্লাহর প্রজ্ঞা ও মন-মানসের প্রতিবিম্ব। তিনি রসুল নন, তবুও রেসালতের জ্ঞানে জ্ঞানবান।

রসুলুল্লাহ স. হুদায়বিয়া প্রান্তরেই পশুগুলোকে কোরবানী করলেন। তাঁর অনুকরণে সাহাবীগণও কোরবানী করলেন। নিশ্চিত বিজয়ের অঙ্গীকার সূত্রে সে বছরই বিজিত হলো খয়বর ও ফাদাক। ওই দুই যুদ্ধে হজরত আবু বকর যথারীতি সঙ্গী হয়েছিলেন রসুলুল্লাহর। খয়বরের প্রসিদ্ধ দুর্গসমূহ তাঁর

আক্রমণেই পর্যুদস্ত হয়েছিলো। পরে সেখানকার প্রধান দুর্গের পতন ঘটে হজরত আলী রা. এর হাতে।

পরের বছর রসুলুল্লাহ স. সাহাবীগণকে নিয়ে ওমরা পালন করলেন। শর্ত মোতাবেক মক্কায় অবস্থান করলেন তিন দিন। এরপর চুক্তির শর্তসমূহ শিথিল হতে লাগলো। শর্তভঙ্গ হতে লাগলো কুরায়েশদের পক্ষ থেকে। তখন রসুলুল্লাহ স. এর মনে মক্কা অভিযানের কথা উদয় হলো।

তিনি স. হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তারা তো আপনারই জ্ঞাতিগোষ্ঠী। তাদেরকে আক্রমণ না করাই ভালো। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! তারা আপনার সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। আপনাকে উন্মাদ, যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলেছে। তাদেরকে পরাভূত না করা পর্যন্ত অন্যান্য আরব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করবে না। সুতরাং সশস্ত্র অভিযান অত্যাবশ্যক। রসুলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহ্‌র পথে আবু বকর নবী ইব্‌রাহীমের মতো। কোমল, কোমলতর। আর ওমর নবী নূহের ন্যায়। পাষাণাপেক্ষা কঠিন। অবশেষে তাঁর সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হলো।

সমরসজ্জার ঘোষণা দেওয়া হলো। মুসলিমজনতা ব্যাপক সাড়া দিলেন। সমবেত হতে লাগলেন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। একদিন শুভ সকালে রসুলুল্লাহ স. দশ হাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা অভিযানে বের হলেন।

ইতোমধ্যে খালেদ বিন ওলীদ এবং আরও কতিপয় কুরায়েশ বীর ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর ফলে কুরায়েশদের প্রতিরোধ ক্ষমতা মুখ থুবড়ে পড়লো। তারা মুসলিমবাহিনীকে বাধা দিতে পারলো না।

রসুলুল্লাহ স. সাহাবীগণকে নিয়ে বিজয়ীর বেশে অগ্রসর হলেন। দেখলেন, মক্কার ললনাকুল বাড়ির বাইরে এসে বিজয়ী বাহিনীকে স্বাগত জানাচ্ছে। রসুলুল্লাহ স. এর পবিত্র ওষ্ঠাধারে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি। তিনি স. বললেন, আবু বকর! এরকম দৃশ্য সম্পর্কে হাস্‌সান যে কবিতা রচনা করেছে, সেই কবিতাটি পাঠ করো। হজরত আবু বকর পাঠ করলেন—

আমার সন্তানেরা ধ্বংস হয়ে যাবে, যদি তারা ওই অশ্বগুলোকে দেখতে না পায়, যেগুলো কাদ্দার (বাবে ওমরার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের) দিক থেকে ধূলি উড়িয়ে দ্রুত ছুটে আসছে। আর কল্পনা করছে রমণীদের বস্ত্রাঞ্চলাভিবাদন।

রসুলুল্লাহ স. বললেন, হাস্‌সান যে দিকের কথা বলেছে, সেই কাদ্দারের দিক দিয়ে পুরো বাহিনীকে মক্কাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে বলো।

মক্কাবিজয়ের প্রথম দিনেই হজরত আবু বকর তাঁর পিতা আবু কোহাফাকে নিয়ে রসুলুল্লাহ স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত করলেন। রসুলুল্লাহ স. বললেন, আবু বকর! ওঁকে কষ্ট করে নিয়ে এলে কেনো। তোমার বয়োবৃদ্ধ পিতার কাছে আমিই তো উপস্থিত হতে পারতাম। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! আপনার কাছে তো সবাইকে আসতে হবে।

রসুলুল্লাহ আবু কোহাফার বুকের উপর তাঁর পবিত্র হাত বুলালেন। বললেন, ইসলাম গ্রহণ করুন। হজরত আবু কোহাফা উচ্চারণ করলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর মোহাম্মদ সত্য রসুল।

মক্কাবিজয়ের কিছুদিন পর হুনায়েন যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হলো। হজরত আবু বকর ওই যুদ্ধেও আল্লাহ্‌র রসুলের প্রধান সঙ্গী হয়ে রইলেন।

এরপর রসুলুল্লাহ স. হজরত আবু বকরকে সেনাধিনায়ক করে তায়েফ অভিযানে বের হলেন। সেখানে হজরত আবু বকর একটি স্বপ্ন দেখলেন। রসুলুল্লাহ স.কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! মনে হয় দুর্গ দখল করা সম্ভব হবে না।

এরপর বনী সাকিফের দুর্গ অবরোধ করা হলো। সেখানে এক রাতে রসুলুল্লাহ স. স্বপ্নে দেখলেন এক পেয়ালা মাখন তাঁর সামনে দেওয়া হলো। হঠাৎ একটি পাখি এসে পেয়ালাটিতে ঠোকর দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মাখনগুলো পড়ে গেলো। তিনি স. স্বপ্নের কথা হজরত আবু বকরকে জানালেন। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবহনকারী! মনে হয় না, এ যাত্রায় আমরা জয়লাভ করবো। তিনি স. বললেন, আমারও তাই মনে হয়।

তবুক যুদ্ধেও হজরত আবু বকর সেনাপতিত্ব করেছিলেন। সেখানে এক রাতে তিনি স. সাহাবীগণসহ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর অগ্রসর হচ্ছিলেন সামনের দিকে। তিনি স. তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, মুজাহিদবাহিনী যদি আবু বকর ও ওমরের অনুগমন করে তবে সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

পনেরো

নবম হিজরীতে হজ ফরজ হলো। দল দলে মদীনায় এসে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। হজের মওসুম সন্নিকটবর্তী হলো। প্রস্তুত হলো তিনশত হজযাত্রীর একটি কাফেলা। রসুলুল্লাহ স. হজরত আবু বকরকে হজাধিনায়ক (আমিরুল হজ) নিযুক্ত করলেন। যথাসময়ে তিনি তাঁর কাফেলা নিয়ে মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

সুরা বারাআত (সুরা তওবা) অবতীর্ণ হলো। সাহাবীগণ বললেন, এই নতুন সুরাতো আমিরুল হজের নিকটে প্রেরণ করা প্রয়োজন। রসুলুল্লাহ স. সম্মত হলেন। সদ্য অবতীর্ণ সুরা বারাআতের প্রথম থেকে ছত্রিশতম আয়াত লিপিবদ্ধ করিয়ে হজরত আলীর সাথে মক্কায় প্রেরণ করলেন। নির্দেশ দিলেন, কোরবানীর দিন জুমরাতুল উলার নিকটে সমবেত জনতার সামনে আয়াতগুলো পাঠ করে শোনাতে হবে।

মক্কায় পৌঁছানোর আগেই হজকাফেলার সঙ্গে মিলিত হতে পারলেন হজরত আলী। হজরত আবু বকর বললেন, তুমি কি আমির হয়ে এসেছো, না কাসেদ (দূত) হয়ে? হজরত আলী বললেন, প্রত্যাদেশপ্রচারকপ্রতিনিধি হয়ে।

হজ শেষ হলো। কোরবানীর দিন মিনা ময়দানে বিশাল জনতার সামনে হজরত আলী আয়াতগুলো পাঠ করে শোনালেন। পাঠশেষে বললেন, জেনে নাও— ১. কাফেরেরা বেহেশতে প্রবেশ করবে না ২. এই বৎসরের পরে কোনো অংশীবাদী (মুশরিক) হজ করতে পারবে না। তারা অপবিত্র ৩. যারা রসুলুল্লাহর সঙ্গে সন্ধি চুক্তিবদ্ধ, তাদের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা হবে। আর যাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের চুক্তি বলবৎ থাকবে কোরবানীর ঈদের দিন থেকে চার মাস পর্যন্ত।

পরের বৎসর রসুলুল্লাহ স. নিজে হজপালনের উদ্দশ্যে মক্কাযাত্রা করলেন। হজরত আবু বকরকেও সঙ্গে নিলেন। হজ শেষে প্রায় দুই লক্ষ বিশ্বাসী জনতার সামনে দিলেন মর্মস্পর্শী ভাষণ। ভাবাবেগপূর্ণ কণ্ঠে

বললেন, হে জনতা! আমি কি আল্লাহ্তায়ালার বাণীসম্ভার তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি? জনতা সমস্বরে উত্তর দিলো, নিশ্চয়। নিশ্চয়।

তিনি স. ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বললেন, হে আমার পরম প্রভুপালক আল্লাহ্! শোনো, তোমার বান্দারা কী বলছে।

রসুলুল্লাহ স. মদিনা ফিরে এলেন। বুঝতে পারলেন, পৃথিবী ত্যাগের সময় সমুপস্থিত। তাঁর এমতো ভাবনা তাঁর প্রধান বন্ধুর অন্তরেও প্রতিচ্ছায়া এঁকে দিলো। বিষণ্নতাময় গাম্ভীর্য গ্রাস করে ফেললো তাঁকে। হজরত আবু বকর তাঁর অন্তর্বেদনাকে গোপনই রাখতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না।

কয়েকদিন পর অবতীর্ণ হলো— 'যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং যখন তুমি দলে দলে মানুষকে আল্লাহ্র ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে .....'। একদিন রসুলুল্লাহ স. জান্নাতুল বাকী কবরস্থান থেকে যখন ঘরে ফিরে এলেন, তখন দেখলেন তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা কাতর কণ্ঠে বললেন 'মাথা গেলো' 'মাথা গেলো'। তিনি স. বললেন, আয়েশা! কার মাথা গেলো, তোমার না আমার। এই বলে তিনি স. শয্যাগ্রহণ করলেন। সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো— রসুলুল্লাহ অসুস্থ। অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি স. নামাজ পড়াতে লাগলেন। দ্বিতীয় দিন নামাজ শেষে ভাষণ দিলেন। বললেন, আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে পৃথিবীর প্রভূত সুখ-বৈভব দান করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর ওই বান্দা সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্কে গ্রহণ করলো।

একথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন হজরত আবু বকর। সমবেত সাহাবীগণ তাঁর রোদনের কারণ বুঝতে পারলেন না। কেউ কেউ তো মনে করলেন, আবু বকর হয়তো অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন। রসুলুল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে আবু বকরকেই প্রেম ও ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ দেখতে পাই। শোনো, আজ থেকে তোমাদের বাড়ির মসজিদের দিকের দরজাগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। খোলা থাকবে কেবল আবু বকরের দরজা।

রোগযন্ত্রণা প্রতিদিন বেড়ে যেতে লাগলো। রসুলুল্লাহ আর মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারলেন না। নির্দেশ দিলেন, আবু বকর নামাজ পড়াবেন। উম্মতজননী আয়েশা সিদ্দিকা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতা তো অত্যন্ত কোমলপ্রাণ। কোরআন পাঠের সময় কেঁদে ফেলবেন। এ দায়িত্ব কি অন্য কাউকে দেওয়া যায় না? রসুলুল্লাহ স. তাঁর পূর্বনির্দেশই বহাল

রাখলেন। হজরত আবু বকর ইমামতি করলেন একটানা সতেরো ওয়াক্ত নামাজের। শুক্রবারে নামাজ শুরু হওয়ার পর রসুলুল্লাহ তাঁর দু'জন নিকটাত্মীয়ের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। টের পেয়ে হজরত আবু বকর পশ্চাদপসরণের উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ স. ইশারায় নিষেধ করলেন। তাঁর পাশে বসে তাঁরই ইমামতিতে নামাজ আদায় করলেন।

শনি ও রবিবারে তাঁর স. অবস্থা হয়ে পড়লো অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু সোমবার ভোরে সুস্থ বোধ করলেন তিনি। তাঁকে প্রফুল্লচিত্ত দেখে আশ্বস্ত ও আনন্দিত হলেন সাহাবীগণ। মসজিদেও এলেন। হজরত আবু বকরের ইমামতিতে নামাজও আদায় করলেন। উল্লসিত হলেন সাহাবীগণ। হজরত আবু বকর হলেন অধিকতর নিশ্চিন্ত। অনুমতি নিয়ে তিনি শহরতলীতে তাঁর এক স্ত্রীর বাড়িতে গেলেন।

কিন্তু বেলা যতোই বাড়তে লাগলো, ততোই অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগলো। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী হজরত আয়েশা সিদ্দিকার বুকে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন তিনি স.। ওই অবস্থায় উচ্চারণ করলেন, বালির রফিকুল আ'লা (হে আমার পরম বন্ধু)। পবিত্র নয়নযুগল নিস্প্রভ হলো। চক্ষু বুঁজলেন। চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে পরবর্তী পৃথিবীর দিকে।

মদীনার ঘরে ঘরে উঠলো মহাপ্রলয়ের কলরব। ঠিক এই সময়ে ফিরে এলেন তাঁর অন্তরতম সাথী হজরত আবু বকর। ঘোড়া থেকে নামলেন। কন্যা আয়েশা সিদ্দীকার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হলেন। রসুলুল্লাহ স.কে একটি ইয়েমেনি চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিলো। তিনি বস্ত্র উন্মোচন করলেন। পবিত্র মুখাবয়বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। পবিত্র ললাটে চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন, তুমি তো সুন্দর হে নবী! জীবনে এবং জীবনোত্তরেও। একথা বলে তাঁকে চাদরাবৃত্ত করে দিলেন আগের মতো।

বাইরে এলেন। ইশকের আগুনে দগ্ধমান জনতা নিরবে সরবে আর্তনাদ করে চলেছে। হজরত ওমর বলে চলেছেন, মিথ্যা কথা। রসুলুল্লাহ মরেননি। মরতে পারেন না। যে এরকম বলবে, আমি তার মস্তকচ্ছেদন করবো। হজরত আবু বকর বললেন, শান্ত হও ওমর। স্মরণ করো, মহাপ্রভুপালক আল্লাহ্ বলেছেন 'নিশ্চয় তুমি মৃত্যুরবণ করবে, তারাও মারা যাবে।' আরও স্মরণ করো উহুদ প্রান্তরে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ 'মোহাম্মদ তো রসুল ব্যতীত

অন্য কিছু নন। নিশ্চয় তাঁর পূর্ববর্তী রসুলগণ পরলোকগমন করেছেন। তিনিও যদি পরপারে চলে যান, তবে তোমরা কী করবে? পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে?

হজরত ওমর সংযত হওয়ার চেষ্টা করলেন। হজরত আবু বকর এবার দৃষ্টিপাত করলেন জনতার দিকে। বললেন, জনমণ্ডলী! শোনো, যারা মোহাম্মদের পূজারী, তারা জেনে নাও, তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র উপাসক, তারা জেনে নাও, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব।

শোক কমলো না। তবু শান্ত হলেন সকলে। ভালো করে বুঝতে পারলেন, আবু বকরের কথাতেই রয়েছে সান্ত্বনা ও শান্তি। শোককে সংযত ও সংহত করার যথানির্দেশনা।

ষোল

মসজিদে নববীতে বসে হজরত ওমর, হজরত আবু উবাদা ও সাহাবীগণ রসুলুল্লাহ স. এর দাফন-কাফন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক আনসার সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি চলুন।

সফিফায়ে বনী সাদায় আনসারগণ মিলিত হয়ে খলিফা নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। তারা সা'দ ইবনে আবু উবাদাকে খলিফা বানাতে চায়।

একথা শুনে হজরত ওমর অস্থির হয়ে গেলেন। বুঝলেন, হজরত আবু বকরকে না জানালে এ সমস্যার কুল কিনারা করা যাবে না। হজরত আবু বকর ও হজরত আবু উবাদা ছিলেন অন্দরমহলে। দাফন কাফনের বিষয়েই কথাবার্তা বলছিলেন তাঁরা। হজরত ওমর লোক পাঠিয়ে হজরত আবু বকরকে বাইরে আসতে বললেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি বাইরে এলেন। বললেন, রসুলুল্লাহর শেষকৃত্য সমাপন করাই এখন সর্বপ্রধান কাজ। তৎসত্ত্বেও কেনো ডেকে পাঠালে বলো?

হজরত ওমর বললেন, এই লোক সংবাদ নিয়ে এসেছে, সফিফায়ে বনী সাদায় আনসারগণ মিলিত হয়ে সা'দ ইবনে আবু উবায়দাকে খলিফা

বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে। বলছে, তাঁকে খলিফা না মানলে মুহাজিরেরা তাদের মধ্য থেকে আর একজন খলিফা নিযুক্ত করতে পারে।

হজরত আবু বকর গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুহূর্তমধ্যে বুঝতে পারলেন, এখন একটি গভীর সংকটের মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। খলিফানির্বাচনই এখন প্রধানতম কাজ। আনসারগণ এখন ভাবাবেগমগ্ন। তাঁদের সম্বিত ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ হজরত ওমর ও হজরত আবু উবায়দাকে নিয়ে সফিফার দিকে চলতে শুরু করলেন। পথে দেখা হলো আসেম বিন আদী এবং উয়ায়েম বিন সা'দ নামক দু'জন মুহাজিরের সঙ্গে। তাঁরা বললেন, ওখানে গেলে কোনো লাভ হবে না। মনে হয় এতোক্ষণে খলিফানির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আমরা সেখানে ছিলাম। আমাদের কোনো কথা শোনা হয়নি। মনে হয় আপনাদের কথাও শোনা হবে না।

হজরত আবু বকর দমলেন না। হজরত ওমর ও হজরত আবু উবাদাকে নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, তখন পর্যন্ত তর্ক-বিতর্ক চলছে। তাঁদেরকে দেখে বিতর্ক থেমে গেলো। দেখা গেলো সভামধ্যে একজন চাদরাবৃত্ত শায়িত ব্যক্তি। হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, উনি কে? জবাব এলো, সা'দ ইবনে উবায়দা। অসুস্থ। আনসারগণ তাঁকে ধরাধরি করে সভামধ্যে শুইয়ে দিয়েছে। শায়িত অবস্থায় তিনি আনসারদের বক্তব্যগুলো শুনে যাচ্ছিলেন। এবার মুখ খুললেন। তাঁর কথা উচ্চস্বরে শুনিয়ে দিতে লাগলেন তাঁর পুত্র।

তিনি বললেন, প্রিয় আনসারজনতা! আল্লাহ্‌র রসুলকে তোমরাই সাহায্য করেছো। ইসলামকে জয়যুক্ত করার কারণে তোমরা অনন্যমর্যাদার অধিকারী। রসুলুল্লাহ স. এর জন্মস্থান মক্কা। সেখানে তিনি দীর্ঘ তেরো বছর ধরে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হননি। যে কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন দুর্বল। রসুলুল্লাহকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, আত্মরক্ষা করার সামর্থ্যও তাঁদের ছিলো না। তখন আল্লাহ্‌পাক তোমাদের উপরে রহমত বর্ষণ করলেন। তোমাদেরকে হতে দিলেন তাঁর আনসার (সাহায্যকারী)। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা তাঁর রসুলকে বাঁচালে, ইসলামকে বাঁচালে। তোমাদের তরবারীই ইসলামের জয়যাত্রাকে দুর্বার করেছে। রসুলুল্লাহ ছিলেন তোমাদের সকলের নয়নমনি। স্বদেশ-স্বসম্প্রদায় ছেড়ে তিনি তোমাদের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর

পবিত্র সমাধিও রচিত হবে এখানে। কাজেই তোমাদের মধ্য থেকেই তাঁর খলিফা নিযুক্ত করতে হবে।

খাজরাজ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনি সত্য বলেছেন। আপনিই আমাদের নেতা। আমরা আপনারই উপদেশ মেনে চলবো। খলিফা করবো আপনাকেই।

হজরত সা'দ বিন উবায়দা ছিলেন খাজরাজ গোত্রের নেতা। তাঁর খলিফা হওয়ার প্রস্তাব আউস গোত্রের আনসারগণের তেমন মনোপুত হলো না। একজন আউস নেতা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ঠিক বলেছো। উত্থাপিত প্রস্তাব না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু মুহাজিরগণ যদি তাঁকে না মেনে নেন?

সভাস্থল নিরব হলো। কিছুক্ষণ পর নিরবতা ভঙ্গ করে একজন বললেন, তাহলে তো দু'জন নেতা নিযুক্ত করতে হবে— একজন আনসার একজন মুহাজির।

এবার হজরত ওমর কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। হজরত আবু বকর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আগে আমাকে বলতে দাও। তুমি বোলো পরে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন— সকল প্রশংসা-প্রশস্তি স্তব-স্তুতি আল্লাহ্‌র। তিনিই চিরঅমুখাপেক্ষী প্রভুপালয়িতা। তিনিই সকলের ও সকলকিছুর একমাত্র উপাস্য। আর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. তাঁর প্রেরিত প্রত্যাদেশবাহক। আমরা তাঁর উম্মত। এতোদিন তিনি আমাদেরকে আলোকিত করে ছিলেন। এখন ঘটেছে তাঁর মহাপ্রস্থান। এখনও তাঁর পবিত্র শেষকৃত্য যথাসম্পাদনের অপেক্ষায়। এরই মধ্যে আমরা শুরু করেছি কলহ-কোন্দল। অবশ্য খলিফা নির্বাচন বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যকর্তব্য। তাই এখানে আপনারা যে উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন, তাকে মহৎ উদ্দেশ্যই বলতে হবে। কিন্তু হে আনসার ভ্রাতৃবৃন্দ! মনে হয় আপনারা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইছেন। আমার অনুরোধ আপনারা বিষয়টিকে নিরপেক্ষনির্ভর করতে চেষ্টা করুন। তাহলে বুঝতে পারবেন এমতো ক্ষেত্রে কুরায়েশ মুহাজিরেরা অধিকতর উপযুক্ত। প্রাচীন ও বংশমর্যাদায় জ্ঞানে গুণে শিক্ষা দীক্ষায় বিত্তবৈভবে ও সামাজিক সম্মানে কুরায়েশ বংশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁরা কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক ও সেবক। আরবের সকল গোত্র তাঁদের প্রতি সমীহ প্রদর্শন করে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদের মধ্যেই প্রেরণ করেছেন

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল। নবী ইব্রাহীমের বংশভূত তাঁরা। মুহাজিরগণ সংখ্যায় অল্প হলেও বিশ্বাসের পথে তাঁরাই অগ্রনায়ক। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য এবং ইসলামের জন্য তাঁরা জীবন, সম্পদ, সময়, স্বদেশ, স্বজন, সম্মান— সব কিছু ত্যাগ করে হিজরত করেছেন। তাঁদের মর্যাদা ও প্রতাপকে সমগ্র আরব সম্মান করে। আনসারগণের এরকম মর্যাদা নেই। সুতরাং তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য হবেন না। আপনারা সংখ্যাগুরু। শুধু এই কারণে যদি খেলাফত দাবী করেন, তবে সে খেলাফতকে মুহাজিরগণ যেমন মানবেন না, তেমনি মেনে নেবে না বৃহত্তর আরব জনতা। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। ইসলাম পরাভূত হবে। বন্ধুগণ! ভেবে দেখুন, দুই আমিরের প্রস্তাবটি অবাস্তব। রসুলুল্লাহ স. কি আমাদেরকে বিভেদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি স. কি মুহাজির ও আনসারদেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেননি। স্বদেশিকতার মাপকাঠিতে খলিফা নির্বাচন করা যায় না, ইসলামের শাশ্বত বিশ্বজনীনতার নিরিখে খলিফা নির্বাচন করতে হয় যোগ্যতা ও যুক্তির মাপকাঠিতে।

প্রিয় আনসার ভ্রাতৃবৃন্দ! ইসলামের দৃষ্টিতে আপনারাও প্রভূত মর্যাদার অধিকারী। বিশ্বাস ও ত্যাগের মহিমায় মুহাজিরের পরেই আপনারা। তাই মন্ত্রণাদাতা হবেন আপনারা। কিন্তু খলিফা অবশ্যই হবেন একজন মুহাজির।

আনসার নেতা হজরত বশীর বিন সা'দ বললেন, আল্লাহ্র শপথ! মুশরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে এবং ইসলামের সেবায় আমাদের আত্মত্যাগের মর্যাদা মুহাজিরদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং বেশী। কিন্তু আমরা এসকল কিছু করেছি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং রসুলুল্লাহর ভালোবাসার টানে। পৃথিবীর পদমর্যাদা ও সম্পদের মোহ আমাদের ছিলো না। রসুল স. ছিলেন কুরায়েশ কুলোদ্ভব। সুতরাং হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা এ ব্যাপারে বিবাদ উপস্থিত কোরো না। রসুলের ভালোবাসার কারণে তাঁদের দাবি অগ্রগণ্য বলে মেনে নাও।

হজরত আবু বকর দেখতে পেলেন, সভাস্থলে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ করুণা বর্ষিত হচ্ছে। তিনি অন্তর্যামী এবং অন্তর্বিবর্তক। তিনি সকলের অন্তরকে শান্ত ও সমাধানমুখী করে দিলেন। হজরত আবু বকর হজরত ওমর ও হজরত আবু উবায়দার মাঝখানে বসেছিলেন। তাঁদের দু'জনের হাত ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন, প্রিয় আনসার ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে

ধারণ করো। আমরা সকলেই একই নবীর উম্মত। আমরা সকলে ভাই ভাই। ইসলামের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখো। আমাদের স্কন্ধে খেলাফতের ভার চাপিয়ে দাও। আমরা কথা দিচ্ছি, তোমাদের পরামর্শ ছাড়া আমরা কিছুই করবো না। আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছেন ওমর ও আবু উবায়দা। যে কোনো একজনকে খলিফা বলে মেনে নাও।

হজরত ওমর বললেন, হে আবু বকর! রসুলুল্লাহ তো আপনাকে নামাজের ইমাম বানিয়েছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও আপনি ইমাম। আপনিই আমাদের খলিফা। হস্ত প্রসারিত করুন— আমি বায়াত হবো। এই বলে তিনি বায়াত হলেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন হজরত আবু উবায়দা, তারপর আনসার সাহাবীগণ।

সতেরো

পরদিন প্রভাতে মসজিদে নববীতে আজান উচ্চারিত হলো। সাহাবীগণ নামাজের জন্য সমবেত হলেন। নামাজ শেষে হজরত ওমর বক্তৃতা শুরু করলেন এভাবে— হে মুহাজির ও আনসার জনতা! গতকাল শোকাঘাতে জর্জরিত হয়ে আমি এমন সবকথা বলেছি যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কখনও বলেননি। আমার ওই উক্তিগুলো ছিলো প্রেমান্ধতার অযথার্থ উচ্ছ্বাস। এখন বলছি, রসুলুল্লাহ সত্যি সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। যেমন ইন্তেকাল করেছিলেন ইতোপূর্বে সকল নবী ও রসুল। কিন্তু নিশ্চিত সান্ত্বনার কথা এই যে, তিনি স. আমাদেরকে দিশাহীন অবস্থায় ছেড়ে যাননি। রেখে গিয়েছেন কোরআন এবং এমন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যিনি হতে পারেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী। তিনি হজরত আবু বকর ইবনে আবু কোহাফা। গতকাল সফিফায়ে বনী সা'দায় তিনি খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, তারা তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছি। এখন আপনারাও তাঁর বায়াত গ্রহণ করুন।

সকলে বায়াত গ্রহণ করলেন। এভাবে জনসাধারণের বায়াত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো। সকলে নিশ্চিত মনে রসুলুল্লাহর শেষকৃত্য সমাপনের দিকে

মনোযোগী হলেন। দাফনের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ পাচ্ছিলো। কেউ মত প্রকাশ করলেন, রসুলুল্লাহকে মক্কায় সমাহিত করা হোক। কেউ বলেন, দাফন করা হোক বায়তুল মাকদিসে নবী-রসুলগণের মাজারের পাশে। কেউ বললেন, মদীনার জান্নাতুল বাকী কবরস্থানই হতে পারে অধিকতর যোগ্য। জানাযার নামাজের বিষয়ে অনেকে এমতো অভিমত প্রকাশ করলেন যে, উন্মুক্ত প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হোক জানাযার নামাজ।

হজরত আবু বকর তাঁর সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য উত্থাপন করলেন। সকলেই খলিফাতুর রসুলের (রসুলের খলিফার) অভিমতকে সর্বান্তকরণে মেনে নিলেন। তিনি বললেন, রসুলুল্লাহ বলেছেন, নবী রসুলগণ যেখানে দেহ রক্ষা করেন, সেখানেই সমাহিত হয়ে থাকেন। আর তাঁর জন্য জানাযা পড়া হোক এভাবে— ঘরের ভিতরে অল্প কয়েকজন ঢুকে একা একা জানাযা নামাজ পড়বে। এভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সকলেই জানাযা পড়তে পারবে। ইমাম কেউ হবে না। তিনিই সকলের ইমাম।

জানাযা শেষ হলো। সাহাবীগণ চোখের সাগরে ভাসিয়ে দিলেন প্রিয়তম রসুলকে। আল্লাহ্‌র শাশ্বত বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। মাটির আড়াল হলেন তিনি স.। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীবাহক রসুল, মহামমতার অপার পারাবার।

হজরত আবু বকর বিষণ্ন মনে মসজিদে উপস্থিত হলেন। মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনতা! আমাকে তোমাদের নেতা নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি খেলাফতের জন্য লালায়িত ছিলাম না। প্রার্থীও হইনি। কখনো প্রকাশ্য ও গোপনে এর জন্য প্রার্থনাও করিনি। তবে আমি তোমাদের প্রস্তাব ও সমর্থন মেনে নিলাম শুধু এ কারণে যে, মুসলমানদের মধ্যে যেনো বিবাদ উপস্থিত না হয়। বিভেদের বিপদ এড়াতে চেয়েছি আমি। এই বিশাল দায়িত্ব বহনের শক্তি-সামর্থ্য-যোগ্যতা আমার নেই। আমি আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যপ্রার্থনা করি। তাঁর শক্তি ও সাহায্য যদি পাই, তবে আমি সঠিকভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারবো। তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তারা আমার কাছে শক্তিশালী হিসেবে বিবেচিত হবে, যতোক্ষণ না আমি তাদের যথাপ্রাপ্য পরিশোধ করে দেই। আর শক্তিশালী যারা তাদেরকেও আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত দুর্বল মনে করবো, যতোক্ষণ না তাদের কাছ থেকে হকদারের হক উসুল করি। আমি

যদি কল্যাণের জন্য কাজ করি, তাহলে আমাকে সাহায্য ও সমর্থন দান কোরো, আর যদি অন্যায় পথে ধাবিত হতে চেষ্টা করি, তবে সংশোধনের পথে নিয়ে এসো। সত্যবাদিতা আমানত, আর মিথ্যাপরায়ণতা খেয়ানত।

'তাবারী' গ্রন্থে রয়েছে, হজরত সাঈদ ইবনে সা'দ রা. কে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে সহচরপ্রবর! আপনি কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। লোকেরা বললো, হজরত আবু বকরের কাছে সাহাবীগণ কখন বায়াত গ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, তাঁরা একটি দিনও খলিফাবিহীনভাবে অতিবাহিত করেননি। পুনঃ প্রশ্ন উত্থিত হলো, কেউ কি হজরত আবু বকরের বিরোধিতা করেছিলেন? তিনি বললেন, না। তবে ধর্মত্যাগীরা বিরোধিতা করেছিলো। কিন্তু তারা সফল হয়নি।

আঠারো

রসুলুল্লাহ স. অন্তিম মুহূর্তে সিরিয়া অভিযানের জন্য একটি সেনাদল প্রস্তুত করেছিলেন। সেনাপতি বানিয়েছিলেন হজরত ওসামা ইবনে যায়েদকে। কিন্তু তিনি স. এর পীড়িত হওয়ার কথা জানতে পেরে হজরত ওসামা তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনার জর্ফ নামক স্থানে থেমে যান। কয়েকদিন পরে যখন রসুলুল্লাহর মহাতিরোধান ঘটে, তখন তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। সৈন্যদেরকে যে যার ঘরে ফিরে যেতে বলেন। নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকেন খলিফাতুর রসুলের।

খলিফাতুর রসুল হজরত আবু বকর কয়েকদিন পরেই নির্দেশ জারী করলেন, ওসামা সিরিয়া অভিযানে যেতে পারবে। তাঁকে বাস্তবায়ন করতে হবে রসুলুল্লাহর অন্তিম নির্দেশ। হজরত ওসামার হাতে পতাকা তুলে দিলেন তিনি। আর হজরত ওসামা জর্ফে উপস্থিত হয়ে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হতে বললেন।

হজরত আবু বকর তাঁর পরবর্তী আদেশে ঘোষণা করলেন, রসুলুল্লাহ স. যাঁকে যে হুকুম করেছিলেন তাঁকে সেই হুকুম পালন করতে হবে। এই

নির্দেশ সকলে পালন করলেন। হজরত ওমরও হজরত ওসামার নিকটে উপস্থিত হলেন। রসুলুল্লাহর নির্দেশানুসারে তিনি ছিলেন হজরত ওসামার অধীন একজন সাধারণ যোদ্ধা।

খলিফা জর্ফে উপস্থিত হলেন। তাঁর আদেশক্রমে ওসামা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। সেনাদলকে যাত্রা করতে বললেন। হজরত আবু বকর ওসামার সাথে পদব্রজে অগ্রসর হতে লাগলেন।

ওসামা বিব্রত হলেন। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, আমিরুল মুমিনিন! অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করুন, নয়তো আমাকে পদব্রজে চলতে বলুন। খলিফা বললেন, আমি ঘোড়ায় চড়বো না। তুমিও নামতে পারবে না। ক্ষতি কী, যদি আমি আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের সঙ্গে কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে চলি। পা দুটোকে সামান্য ধূলিধূসরিত হতে দিই। তিনি আরও বললেন, তোমার অনুমতি হলে আমি ওমরকে ফিরে পেতে চাই। তার পরামর্শ আমার প্রয়োজন। উসামা খলিফার আবেদনকে আদেশরূপে শিরোধার্য করলেন।

খলিফা সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি তোমাদেরকে কয়েকটি উপদেশ দিচ্ছি। সাবধান! নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা কোরো না। বৃক্ষ কর্তন কোরো না। লুণ্ঠন কোরো না। ঘরবাড়িতে আগুন দিয়ো না। অযথা উট ছাগল মেষপালকে মেরে ফেলো না। মঠবাসী পুরোহিত ও ধর্মযাজকদেরকে হত্যা কোরো না। দেখবে, হয়তো কোনো স্থানের লোকেরা তাদের দেব-দেবীদের মূর্তি অংকিত পাত্রে করে তোমাদের সামনে খাদ্যদ্রব্য হাজির করবে। তখন খাদ্যগ্রহণকালে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নাম নিতে ভুল কোরো না।

শেষে ওসামাকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্‌র নামে অগ্রসর হও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেফাজত করুন।

তিন বছর আগে সিরিয়া অভিযাত্রীদের অধিনায়ক হয়ে এসেছিলেন ওসামার পিতা হজরত যায়েদ। তিনি যে প্রান্তরে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন, সেই প্রান্তরে উপস্থিত হলেন ওসামা। তুমুল যুদ্ধ করলেন শত্রুদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত এক সময় তাঁর পিতার হন্তারককে বধ করতে সক্ষম হলেন। পূর্বপরাজয়ের প্রতিশোধ গৃহীত হলো। বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হলো। সিরিয়া সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত হলো শান্তি। বিজয়ী বাহিনী প্রচুর গনিমত নিয়ে বীর বেশে ফিরে এলো মদীনায়।

এই যুদ্ধের ফলে রোমক ও পারসিকেরা এই ভেবে সংযত হলো যে, খলিফা আবু বকর অকুতোভয়। সাহস ও সাধ্য দুটোই তাঁর আছে। নয়তো নবীতিরোধানের পরক্ষণে তিনি এরকম শক্তিশালী বাহিনী গঠন করতে পারতেন না।

ঊনিশ

ওসামার সিরিয়া যাত্রার পরে পরেই মদীনার আকাশে দেখা দিলো দুর্যোগের কালো মেঘ। রসুলুল্লাহর সময়ে শেষ দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, তারা ধর্মত্যাগ করার ঘোষণা দিলো। মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। কোনো কোনো গোত্র বললো, আমরা ইসলামের অন্যান্য অনুশাসন মানলেও যাকাত দিবো না। এদিকে মদীনা অরক্ষিত। মূল সেনাবাহিনী সিরিয়ায়। এই সুযোগে বিদ্রোহীরা মদীনার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হলো।

এ সময় হজরত আমর ইবনে আস রা. সরে জমিনে দেখে এসে খলিফাকে সংবাদ দিলেন, বিদ্রোহীরা মদীনার পুরো সীমানা ঘিরে ফেলেছে। মদীনা এখন সম্পূর্ণতই শত্রুপরিবেষ্টিত। বিদ্রোহীরা অবশ্য প্রথমেই আক্রমণ করলো না। কী ভেবে তাদের প্রতিনিধিদল পাঠালো। তারা বললো, ঠিক আছে, আমরা যুদ্ধ করবো না। আমরা নামাজ পড়বো, কিন্তু জাকাত দিবো না। এই শর্ত যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে আমরা যুদ্ধ করবো না। আমরা চাই শান্তি।

খলিফা পরামর্শসভা আহ্বান করলেন। দেখলেন, সকলেই কেমন নিষ্প্রভ। হজরত ওমর বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! ওরা জাকাত না দিলেও নামাজ তো পড়বে। ইসলামকে তো পুরোপুরি পরিত্যাগ করবে না। তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করাই তো সমীচীন বলে বোধ হয়। আর আমাদের প্রধান শক্তি তো সিরিয়ায়। সে কথাও তো ভাবতে হবে।

খলিফা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, ওমর! ইসলামগ্রহণের পূর্বে তুমি তো সাহসী ছিলে, এখন এরকম কাপুরুষতা প্রদর্শন করছো কেনো?

রসুলুল্লাহ তো আমাদেরকে পূর্ণ ইসলাম পালন করতে বলেছেন। তাঁর মহাতিরোধান ঘটেছে মাত্র দশ দিন আগে। এর মধ্যেই আমরা পূর্ণতাকে পরিত্যাগ করবো? নামাজ ও জাকাত কি আল্লাহ্তায়ালার একই রকম গুরুত্ববহ নির্দেশ নয়? তুমি কি চাও, আল্লাহ্র নির্দেশ ও রসুলুল্লাহর শিক্ষা ইসলামের প্রথম খলিফার দ্বারাই লংঘিত হোক? আল্লাহ্র শপথ! আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

প্রতিনিধিদল নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। খলিফা নগরবাসীদের একত্র করে ভাষণ দিলেন, ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা বিপদকবলিত। বিদ্রোহীরা মদীনার চারিদিকে সমবেত হয়েছে। যে কোনো সময় তারা মদীনা আক্রমণ করতে পারে। তাই আমি আহ্বান জানাই, প্রস্তুত হও। শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে। ধর্ম ও দেশকে বাঁচাতে হবে।

খলিফার আহ্বানে সাড়া পড়ে গেলো অল্পক্ষণের মধ্যে। প্রস্তুত হলো একটি ক্ষুদ্র, অথচ শক্তিশালী সেনাবাহিনী। হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত যোবায়ের এবং হজরত তালহা খলিফার পাশে এসে দাঁড়ালেন। খলিফা তাঁদেরকে গুরুত্বপুর্ণ কয়েকটি স্থানের প্রহরী নিযুক্ত করলেন।

তিন দিন পরে খবর পাওয়া গেলো বিদ্রোহীদের একটি দল 'ধুলকাসা'র দিক থেকে মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। খলিফা তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। অতর্কিত আক্রমণ করে শত্রুবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। এরপর মদীনায় ফিরে এলেন বটে, কিন্তু রাতে আবার আক্রমণ করলেন। বহুদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন শত্রুদেরকে।

কয়েকদিন পরে ওসামা তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন। মদীনায় স্বস্তি ফিরে এলো। খলিফা ওসামা ও তাঁর বাহিনীকে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে বললেন। নিজে আবার অভিযানে বের হবেন বলে ঘোষণা দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! আপনি রাজধানী ত্যাগ করলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হবে। অন্য কাউকে প্রেরণ করুন। একজন শহীদ হলে তদস্থলে অন্য কাউকে সেনাপতি করা যাবে। কিন্তু আপনার অভাব অপূরণীয়।

খলিফা তাঁদের কথা মানলেন না। বীরবিক্রমে তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে ধুলকাসা অতিক্রম করে 'রবজা' পরগনার অন্তর্গত আবরাক নামক স্থানে উপনীত হলেন। শত্রুরা যুদ্ধ করতে সাহস করলো না। বশ্যতা স্বীকার

করলো। তিনি আবরাক প্রান্তরকে মুসলিম সৈন্যদের অশ্বচারণভূমি করার ঘোষণা দিয়ে নিরাপদে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন।

সেনাবাহিনীর বিশ্রামগ্রহণ সমাপ্ত হলো। তিনি তাদের অধিনায়কত্ব ও দায়িত্ব বণ্টন করে দিলেন এভাবে— ১. সাইফুল্লাহ খালেদ ইবনে ওলীদ রা.— তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হলো, ভণ্ডনবী তুলাইহাকে উৎখাত করতে হবে। তারপর অভিযান পরিচালনা করতে হবে মালিক ইবনে জুয়াইরার বিরুদ্ধে। ২. ইকরামা ইবনে আবু জেহেল— তাকে পাঠানো হলো ভণ্ডনবী মুসাইলামার বিরুদ্ধে ৩. শোরাহবিল ইবনে হাসানা— তাঁকে বলা হলো পশ্চাদভাগে থেকে খালেদ ইবনে ওলীদকে মুসাইলামা উৎখাতে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। উৎখাত শেষে কাযাআর যুদ্ধে হজরত আমর ইবনে আসের বাহিনীতে মিলিত হতে হবে ৪. মুহাজির ইবনে উমাইয়া— তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো, আসওয়াদ আনাসীর অনুসারীদের সঙ্গে এবং মাআওনাতে আবনা (ইয়েমেনে বসবাসকারী পারস্যের একটি দল) এর সাথে যুদ্ধ করবে। তাদেরকে পরাজিত করে ঝাঁপিয়ে পড়বে বনী কিনদা গোত্রের ধর্মত্যাগীদের উপরে ৫. হুযাইফা ইবনে মেহসান— তাঁকে বলা হলো, অভিযান পরিচালনা করতে হবে ইয়েমেনের প্রাচীন রাজধানী দাব্বায়। ৬. আরফাজা ইবনে হারসাসা— তাঁকে পাঠানো হলো মুহরাবাসীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য ৭. যুওয়াইদ ইবনে মুরকিন— তাঁকে বলা হলো, দমন করতে হবে তেহমা অঞ্চলের ধর্মত্যাগীদেরকে ৮. আলাউল হাযরামী— তিনি ইসলামী নিশান উড্ডীন করবেন বাহরাইনে ৯. তরিফা ইবনে হাজেয— তিনি নির্মূল করবেন বনী সুলাইম ও বনী হাওয়াযেনের মিলিত শক্তিকে ১০. হজরত আমর ইবনে আস— তিনি অভিযানে বের হবেন কাযাআ এলাকার দিকে ১১. খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস— তিনি যাবেন সিরিয়ায়।

নির্দেশ মোতাবেক সেনাবাহিনীসমূহ স্ব স্ব অঞ্চলের দিকে চলে গেলো। খলিফা তাঁদের জন্য একটি নির্দেশপত্র প্রস্তুত করলেন। প্রত্যেক বাহিনীর সেনাপতির নামে নির্দেশপত্রগুলো যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া হলো। তিনি লিখলেন— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। রসুলুল্লাহর খলিফার পক্ষ থেকে

ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনানায়কগণের প্রতি প্রেরিত নির্দেশনামা— প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্তায়ালাকে ভয় করতে হবে। তাঁর নির্দেশানুযায়ী চলতে হবে। যারা ইসলাম পরিত্যাগ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। প্রথমে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানাতে হবে। আত্মসমর্পণ করলে কোনো যুদ্ধ নয়। বিদ্রোহী হলে অবশ্যই শায়েস্তা করতে হবে। ইসলাম কবুল করলে সকল বিধান মেনে নিতে হবে। পালন করতে হবে আল্লাহ্র ও আল্লাহ্র বান্দাদের হক। আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হলে অবকাশ দেওয়া যাবে না। যুদ্ধ করতে হবে। মুসলিম সৈন্যগণ! শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অবহেলা কোরো না। ইসলামের বশ্যতা স্বীকার না করে কেউ ইসলামের জন্য দান করলে তা গ্রহণ করবে না। মুসলমানদের সাথে সর্ববিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। একজনকে অন্যজনের উপরে প্রাধান্য দিবে না। সঙ্গী ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথায় ও কাজে নম্রতা প্রদর্শন করবে।

বিশ

মিথ্যা নবুয়তের দাবীদারেরাও সৃষ্টি করলো একটি নতুন হুমকি। তারা ছিলো সংখ্যায় চারজন— তিনজন পুরুষ ও একজন নারী— ১.আসওয়াদ আনসি ২. মুসায়লামা ৩. তুলাইহা এবং ৪. সাজাহ। রসুলুল্লাহ স.ই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসুল— ইসলামের এই মৌলিক বিশ্বাসটির ভিত্তিমূলে আঘাত করলো তারা।

আসওয়াদ আনসি বাস করতো ইয়েমেনে। সে ছিলো গোত্রপতি, অনেক ধন ও জনের মালিক। সে ঘোষণা করলো, তার কাছে অনেক আধ্যাত্মিক খবর আসে— ওহী নাজিল হয়। তার এমতো ঘোষণা জনমনে প্রভাব বিস্তার করলো। পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর সঙ্গে সন্ধি করলো সে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত করলো তার প্রভূত প্রতিপত্তি। ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং রসুলুল্লাহ স. কর্তৃক নিয়োজিত ওই এলাকার শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করলো। এরপর নাজরান প্রদেশ অধিকার করলো। পরে অধিকার করলো ইয়েমেনের রাজধানী সানা। সানার শাসনকর্তা বাজানকে হত্যা করে তার বেগমকে বিবাহও করলো সে।

রসুলুল্লাহ তাকে শায়েস্তা করার জন্য হজরত মায়াজ ইবনে জাবালকে এবং আরও কয়েকজনকে আসওয়াদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। তাঁরা সুকৌশলে গভীর রাতে আসওয়াদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করলেন। এই ঘটনাটি সংঘটিত হলো রসুলুল্লাহ স. এর মহাপ্রস্থানের দুই একদিন আগে। কিন্তু সংবাদটি মদীনায় যখন পৌঁছলো, তখন তিনি স. আর নেই। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন হজরত আবু বকর। ইয়েমেনে তাঁর মহাপ্রস্থানের সংবাদ পৌঁছলো। তখন আসওয়াদের অনুসারীরা আবার ঘুরে দাঁড়ালো। উড্ডিন করলো বিদ্রোহের পতাকা।

মুসায়লামা ছিলো আরবের ইয়ামামা প্রদেশের অন্তর্গত বনি হানিফা গোত্রের দলপতি। নবম হিজরী সনে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধিদল মদীনায় গমন করেছিলো। তখন মুসায়লামা প্রতিনিধিত্ব করেছিলো তার গোত্রের। কিন্তু মদীনা থেকে নতুন একটি ধারণা নিয়ে ফিরলো সে। ভাবলো, সে যদি নবী হওয়ার ঘোষণা দেয়, তবে রসুলুল্লাহর মতো সেও প্রভুত্ব করতে পারবে। সে কতকগুলো বাক্য রচনা করে প্রচার করলো। বললো, এগুলো ওহী হিসেবে তার কাছে এসেছে। শুধু তাই নয় রসুলুল্লাহ স. এর কাছে সে পত্র লিখলো এভাবে— আল্লাহ্‌র রসুল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র রসুল মোহাম্মদের প্রতি— আল্লাহ্‌ আমাকে আপনার অংশীদাররূপে প্রেরণ করেছেন। এই পৃথিবীর অর্ধেক দিয়েছেন আমাকে এবং বাকী অর্ধেক দিয়েছেন কুরায়েশ গোত্রকে। কিন্তু কুরায়েশরা অত্যাচারী...

রসুলুল্লাহ স. পত্রের উত্তরে লিখলেন— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহ্‌র রসুল মোহাম্মদের নিকট থেকে ভণ্ডনবী মুসায়লামার প্রতি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। ন্যায়পরায়ণদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয় মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ্‌। তিনি তাঁর বন্দাগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন, দান করেন। পরবর্তী পৃথিবীতে পুরস্কৃত হবে কেবল ধার্মিকজনগণ।

তুলাইহা ছিলো আসাদ গোত্রের জননেতা এবং নজদ অঞ্চলের এক নামকরা যোদ্ধা। একবার সে তার গোত্রের লোকদের সঙ্গে একটি মরুপ্রান্তর পার হচ্ছিলো। এমন সময় পানির প্রয়োজন দেখা দিলো। তুলাইহা একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো, ওই খালে পানি আছে। সত্যিই সেখানে পানি পাওয়া গেলো। সে মনে মনে ভাবলো, আমি তো তাহলে

নবী। মুখেও ঘোষণা করলো, আমি নবী। তোমাদেরকে একটি মোজেজা দেখালাম। লোকেরা তার কথা বিশ্বাস করলো। তখন থেকে সে হয়ে উঠলো ইসলামবিদ্বেষী।

খলিফা হজরত আবু বকরের আমলে খালেদ ইবনে ওলীদের হাতে সে পরাস্ত হয়। সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। পরে তওবা করে মুসলমান হয়ে যায়।

সাজাহ ছিলো মধ্য আরবের বনী ইয়ারবু গোত্রের এক নারী। সেও নবুয়তের দাবী করে বসলো। বললো, আমার কাছে প্রত্যাদেশ আসে। তার স্বজাতিরা মেসোপটেমিয়ার বনি তাগলীব নামক খৃষ্টান উপজাতিদের মধ্যে বাস করতো। সে নিজেও ছিলো খৃষ্টান। সে যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের বিদ্রোহের সংবাদ পোলো তখন পার্শ্ববর্তী খৃষ্টান গোত্রগুলোর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করলো। এভাবে শাক্তি সঞ্চয় করে এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হলো। বনী তামিমের একাংশকেও দলভূত করতে সক্ষম হলো সে। তার উদ্দেশ্য ছিলো প্রতিদ্বন্দ্বী মুসায়লামাকে প্রথমে পরাস্ত করবে, তারপর আক্রমণ করবে মদীনা।

মুসায়লামা নানারকম উপঢৌকনসহ সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। সাজাহ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। মুসায়লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। উভয়ে উভয়ের দাবি মেনে নিলো। শেষে তার সাথে বিবাহবদ্ধও হলো। ওই সময় মহাবীর খালেদের অধীনে বহুসংখ্যক মুসলিম ওই অঞ্চলে উপস্থিত হলো। তাদেরকে দেখে সাজাহর মদীনা আক্রমণের কল্পনা কর্পুরের মতো বিলীন হয়ে গেলো। তিনদিন মুসায়লামার কাছে থাকার পর সে তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে বনী তাগলীবে তার আপনজনদের কাছে ফিরে গেলো। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

খালেদ মুসায়লামাকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে মুসায়লামা নিহত হলো। এভাবে চারজন ভণ্ড নবীর মধ্যে আসওয়াদ ও মুসাইলামা এই দু'জন নিহত হলো। আর ইসলামে ফিরে এলেন অবশিষ্ট দু'জন— তুলাইহা ও সাজাহ।

বিভিন্ন প্রকারের বিদ্রোহ দমন করতে করতেই হজরত আবু বকরের প্রথম এক বছরের শাসনকাল শেষ হয়ে গেলো। হজরত আবু বকর যেনো নতুন করে বৃহত্তর আরব দখল করে নিলেন। ইসলামের আলোয় আরববাসীরা এবার বিশাল পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারলো। লাভ করলো বিশ্বদৃষ্টি। বুঝতে পারলো, ইসলাম শুধু আরবের নয়, সারা বিশ্বের।

এভাবে ইসলামের প্রথম খলিফা সবাইকে বিশ্বমানবতার কথা ভাবতে শেখালেন।

একুশ

খলিফা আবু বকর একটি বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত হলেন। চতুর্দিকের যুদ্ধবিগ্রহ দমন করতে গিয়ে যে যুদ্ধগুলো করতে হলো সেগুলোতে বহুসংখ্যক হাফেজে কোরআন শহীদ হয়ে গেলেন। এভাবে শহীদ হতে থাকলে কোরআন পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং কোরআন সংকলন করে লিপিবদ্ধ করতে হবে। হজরত ওমরও এসকল কথা ভাবছিলেন। তিনি খলিফার কাছে কোরআন পাককে একত্রবদ্ধ করে গ্রন্থরূপ দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করলেন।

খলিফা বললেন, তাই তো করা উচিত। কিন্তু রসুলুল্লাহ যে কাজ করেননি, সে কাজ করা আমাদের উচিত হবে তো? হজরত ওমর বললেন, আমরা তো কোরআনই একত্র করবো এবং গ্রন্থরূপ দেবো। সুতরাং তা রসুলুল্লাহর উদ্দেশ্যেকেই দৃঢ়বদ্ধ করবে।

খলিফা বিষয়টি নিয়ে আরও ভাবলেন। তারপর হজরত যায়েদ ইবনে সাবেতকে কোরআন বিন্যস্ত করে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দিলেন। এ বিষয়ে হজরত যায়েদই ছিলেন সবার চেয়ে অধিক যোগ্য ও অভিজ্ঞ। তিনি নিজে ছিলেন প্রধান ওহী লেখক। যখন ওহী নাজিল হতো, তখন সাহাবীগণ খেজুর গাছের শাখা, হাড়, চামড়া, শিলাখণ্ড এবং দুষ্প্রাপ্য এক ধরনের কাগজে সেগুলো লিখে নিতেন। তাঁরা রসুলুল্লাহর নির্দেশক্রমে আয়াত ও সুরাগুলোকে সাজিয়ে লিখতেন। একটি সুরার অবতরণপ্রবাহ শেষ হলে রসুলুল্লাহ তার নাম নির্ধারণ করে দিতেন। কখনো একসঙ্গে একাধিক সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি স. সেগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলোর নির্দিষ্ট নামকরণও করেছেন। হজরত যায়েদ এসকল বিষয়ে ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক ওয়াকিফহাল। তিনি গভীর মমতা ও শ্রম

দিয়ে কোরআনের সুরাগুলো সংগ্রহ ও সংকলন করলেন। দিলেন লিপিবদ্ধ রূপ। গ্রন্থিত হলো কোরআন। খলিফা আবু বকরের কাছে গ্রন্থখানি সংরক্ষিত রইলো।

যে পদ্ধতিতে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন, সেইটিই গণতন্ত্রের প্রকৃষ্টরূপ। গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজে তিনি সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শবিনিময় করতেন। গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে দূরদর্শী ও ফকিহ সাহাবীগণকে ডেকে পাঠাতেন। মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মধ্যে ওমর, ওসমান, আলী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, মায়াজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবেত প্রমুখ হজরতগণের সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি কোনো কাজে হাত দিতেন না।

সমগ্র আরব ভূখণ্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেই তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামল শেষ হয়ে যায়। তবে এ কথাও ঠিক, ইসলামের বিশ্ববিজয়ের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেন তিনিই। আরব দেশকে তিনি আটটি প্রদেশে ভাগ করেন— মদীনা, মক্কা, তায়েফ, সানা, নাজরান, হাজরা মাওত, বাহরায়েন ও দুমাতুল জান্দাল। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য উপযুক্ত প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ফলে সুশাসন সুনিশ্চিত হয়।

তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে নসিহত করতেন এভাবে— প্রকাশ্য, গোপন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে ভয় কোরো। তিনি এমন সব উপায়ে জীবনোপকরণের সংস্থান করেন, যা কল্পনা করা যায় না। যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন। প্রদান করেন প্রতুল পুরস্কার। আল্লাহ্র বান্দা-বান্দীদের প্রতি মমতাপরবশ হওয়া তাকওয়ার নিদর্শন। তুমি এমন এক পথ ধরেছো, যেখানে দায়িত্বসচেতন হওয়া অত্যাবশ্যক। সুতরাং জীবনযাপন করতে হবে অবহেলামুক্ত হয়ে।

ইয়াজিদ ইবনে সুফিয়ানকে সিরিয়া অভিযানের দায়িত্ব অর্পণের সময় তিনি বললেন, হে ইয়াজিদ! তোমার অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। তুমি হয়তো সরকারী প্রভাব খাটিয়ে তাদের উপকার করতে পারবে। আমি এই বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি। রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, কেউ মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত হয়ে যদি অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে সরকারী পদ দেয়, আল্লাহ্ তার উপর লানত বর্ষণ করেন। আল্লাহ্ তার কোনো ওজর আপত্তি অথবা বিনিময় কবুল করবেন না। সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।

তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের। মানুষের ছোট খাট দোষ-ত্রুটি তিনি উপেক্ষা করতেন। কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনা ও ধর্মীয় কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ছিলেন কঠোর। এমতোক্ষেত্রে কারো অবহেলা এবং উদাসিনতাকে তিনি সহ্যই করতেন না।

অপরাধীদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন সহানুভূতিপ্রবণ। রসুলুল্লাহ স. এর সময়ে আসলাম গোত্রের এক লোক তাঁর কাছে এসে তার ব্যভিচার করার দোষ স্বীকার করে। তিনি বলেন, তুমি অন্য কাউকে একথা বলোনি তো? সে বললো, না। তিনি বললেন, এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করোনি তো? সে বললো, না। তিনি বললেন, তবে অনুতপ্ত হও। তওবা করো। আল্লাহ্পাক বান্দাদের তওবা কবুল করেন। লোকটি অবশ্য হজরত আবু বকরের পরামর্শটি গ্রহণ করেনি। রসুলুল্লাহ স. এর দরবারে গিয়ে চিৎকার করে দোষ স্বীকার করেছিলো। স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলো ব্যভিচারের শাস্তি।

তওবাকারীকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন। তিনিও তাদেরকে ভালোবাসতেন। নবুয়তের দাবিদার আসওয়াদ বন্দী হয়ে এলে তওবা করে ও জীবন ভিক্ষা চায়। তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। উপরন্তু তাঁর শ্যালিকা উম্মে ফারুকাকে তার সাথে বিবাহবদ্ধ করে দেন। রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান। তিনি জনগণের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বভার অর্পণ করেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উপর। কিছুসংখ্যক অপরাধের জন্য শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করেন। মদ্যপদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেন ৪০টি বেত্রাঘাত।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজপথগুলোকে নিরাপদ রাখার প্রতি তিনি বিশেষভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আয়াস সালমী ছিলো কুখ্যাত ডাকাত, সন্ত্রাসী। তিনি তাকে তায়েফা বিন আজেরের মাধ্যমে সুকৌশলে গ্রেফতার করেন এবং তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেন।

হজরত আবু বকর শরীয়তের সীমালংঘনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একবার ইয়ামামার আমীর হজরত মুহাজির ইবনে উমাইয়া দু'জন গায়িকাকে হাতকাটা ও দাঁত তুলে নেওয়ার শাস্তি দেন। বিষয়টি যখন খলিফার গোচরে এলো, তখন তিনি উষ্মা প্রকাশ করলেন। বললেন, তাড়াহুড়া করা ঠিক হয়নি। আমি হলে রসুলুল্লাহ স. এর নিন্দাসূচক সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য

একজনকে মৃত্যুদণ্ড দিতাম, কারণ সে এমতো অপকর্মের জন্য মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, যদি সে পূর্বে মুসলমান থেকে থাকে। আর জিম্মি হলে হয়েছে চুক্তি ভঙ্গকারিনী। আর ওই গায়িকাটিকে শাস্তি দেওয়াই ঠিক হয়নি, যে মুসলমানদের সমালোচনা করে গান গায়। তাকে সতর্ক করে দিলেই চলতো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা অতো বড় অপরাধ নয়। এটা তোমার প্রথম ভুল, নয়তো এরকম ভুল সিদ্ধান্তের জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হতো।

রসুলুল্লাহ স. এর সময় পৃথক অর্থদপ্তর ছিলো না। তিনিও পৃথক অর্থ বিভাগ খোলেননি। খেলাফতের প্রথম বছরে তিনি স্বাধীন ব্যক্তি, দাস-দাসী, নারী-পুরুষ, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত নির্বিশেষে সবাইকে দশ দিরহাম করে বিতরণ করেন। পরের বছর অধিক অর্থ সমাগম ঘটে। তখন তিনি বিতরণ করেন জন প্রতি বিশ দিরহাম করে। এরকম নীতির বিরুদ্ধে জনৈক ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করলে তিনি বলেন, সামাজিক ও অন্যবিধ মর্যাদার তারতম্য অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। শেষের দিকে তিনি একটি বায়তুল মাল গঠন করেন। কিন্তু তেমন কোনো সঞ্চয় সেখানে ছিলো না।

রসুলুল্লাহ স. এর সময়ে কেবল আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই জেহাদের প্রচলন ঘটেছিলো। পার্থিব প্রাপ্তি উদ্দেশ্য ছিলো না। হজরত আবু বকর সেই শিক্ষাই সকল জেহাদে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সেনাবাহিনীর যাত্রাকালে তিনি বারবার একথা স্মরণ করিয়ে দেন। যেমন সিরিয়া অভিযান কালে তিনি সেনাপতিকে বলেন, সেখানে তুমি একটি দলের দেখা পাবে। তারা আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী। ওই দলটিকে ছেড়ে দিবে। সম্মুখ যাত্রাকালে আমার এই উপদেশগুলোকে মেনে চলবে— ১. নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, ২. ফলন্ত বৃক্ষ কর্তন করবে না ৩. জনপদ ধ্বংস করবে না ৪. খাবার প্রয়োজন ব্যতীত উট ও বকরী জবাই করবে না। ৫. খেজুরের বাগান ধ্বংস করবে না ৬. গনিমত বণ্টনের সময় কারচুপি পরিহার করবে ৭. কখনোই কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না ।

হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করেন। সবাইকে এইমর্মে সাবধান করে দেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রসুল থেকে এমন সব হাদিস বর্ণনা করছো, যে সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্যেই মতভেদ দেখা দিচ্ছে। সুতরাং এখনই যদি অধিকতর সতর্ক না হও, তবে

পরবর্তীরা আরও বেশী বিতর্ক ও মতবৈষম্যে লিপ্ত হবে। তার এমতো উপদেশ পালন করা হয়। তিনি নিজেও এবিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন।

একবার দাদীর হক সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি হলো। কোরআনপাকে এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না থাকায় হাদিসের নির্দেশনা জানার প্রয়োজন পড়লো। হজরত মুগিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি জানি রসুলুল্লাহ দাদীকে ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। হজরত আবু বকর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রশ্ন করলেন, কোনো সাক্ষী আছে? হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেন। হজরত আবু বকর সেরকমই নির্দেশ জারী করলেন। পরবর্তী খলিফা হজরত ওমরও এই বিধানটি মেনে চলেন।

একটি ফতোয়া বিভাগও প্রতিষ্ঠিত করেন হজরত আবু বকর। ফতোয়া দানের দায়িত্ব দেন সর্বহজরত ওমর, ওসমান, আলী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, মায়াজ ইবনে জাবাল, আবী বিন কা'ব এবং যায়েদ বিন সাবেতকে রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

রসুলুল্লাহ স. এর অঙ্গীকার পূর্ণ করা ও ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব রাষ্ট্রের— হজরত আবু বকর সর্বান্তকরণে এই নিয়মটি স্বীকার করে নেন। প্রথম সুযোগেই তিনি এই গুরুদায়িত্বটি থেকে মুক্ত হয়ে যান। বাহরাইন থেকে গনিমত আসার পরেই তিনি ঘোষণা করে দেন, রসুলুল্লাহর কাছে কারো কোনো কিছু পাওনা থাকলে অথবা তিনি কাউকে কিছু দানের অঙ্গীকার করে থাকলে তারা যেনো খলিফার কাছ থেকে তা নিয়ে নেন। এমতো ঘোষণা শুনে হজরত জাবের জানান, রসুলুল্লাহ তাঁকে তিন আঁজলা দিতে চেয়েছিলেন। হজরত আবু বকর তাঁর উভয় হাত একত্র করে তিন আঁজলা দিলেন। হজরত আবু বশীর মাজনী বললেন, আমি পাই চৌদ্দশত দিরহাম। তাঁর দাবিও মেনে নেওয়া হলো।

নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমার সঙ্গে তাঁর সামান্য ভুল বুঝাবুঝি ছিলো। পরে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তিনি তা মিটমাট করে নেন। উম্মতজননীগণের সুখসুবিধার জন্য তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিলো। রসুলুল্লাহ স. যাঁদের সম্পর্কে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, অথবা যাঁদের প্রতি তিনি বিশেষ অনুকম্পাদৃষ্টি প্রদান করতেন, তিনি তাঁদেরকে ভালোবাসতেন খুব। তিনি স. প্রায়শঃ উম্মে আয়মানের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। হজরত আবু বকর তেমনিই

করতেন। ছানদার নামক ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেওয়ার সময় তিনি স. বলেছিলেন, আমি প্রতিটি মুসলমানকে তোমার সঙ্গে সদয় ব্যবহারের অসিয়ত করছি। হজরত আবু বকর তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন।

'জিযিয়া' কর প্রদানের বিনিময়ে যে সকল অমুসলমান মুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপদ বসবাসের অধিকার পায়, তাদেরকে বলা হয় জিম্মি। তিনি তাদের যথাঅধিকার নিশ্চিত করেন। হীরা নামক স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ভাষা ছিলো এরকম— তাদের সমাবেশস্থল ও গির্জাগুলোকে ধ্বংস করা হবে না। প্রয়োজনের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষাকল্পে যেসকল ভবনে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, সেগুলোকেও নষ্ট করা হবে না। নাকুশ ও ঘন্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না। আর উৎসবের সময় ক্রুশ বের করার উপরেও কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকবে না।

তাঁর সময়ে জিযিয়া করের হার ছিলো খুবই কম। তাও আবার ধার্য করা হতো সক্ষম ব্যক্তিদের উপর। হীরার সাত হাজার অমুসলিমের মধ্যে এক হাজার ছিলো জিযিয়ামুক্ত। অন্যদের উপরে বার্ষিক জিযিয়া ধার্য করা হয়েছিলো মাত্র বৎসরে দশ দিরহাম করে। চুক্তিপত্রে একথাটিরও উল্লেখ ছিলো যে, বৃদ্ধ, পঙ্গু ও নিঃস্ব অমুসলিমেরা জিযিয়া থেকে অব্যহতি তো পাবেই, উপরন্তু পাবে প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ। ইসলাম প্রচারকেই তিনি প্রধান কর্তব্যকর্ম বলে মনে করতেন। দিকে দিকে মুজাহিদবাহিনী প্রেরণ করতেন মূলতঃ এই উদ্দেশ্যেই। যেমন রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শত্রুদেরকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবে। ওই এলাকার আরব গোত্রগুলোর কাছেও ধর্মপ্রচার করতে হবে।

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী বলেই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তাঁর বক্তব্যভঙ্গি ও ভাষা ছিলো সুন্দর। জীবনের প্রথম দিকে কবিতা রচনা করতেন। পরে তাঁর কাব্যচর্চার সময় আর হয়ে উঠেনি। তবুও কখনো কখনো আবেগাতিশয্যে মনের কথা কবিতায় প্রকাশ পেতো। যেমন একবার ইমাম হোসেন রা. কে তাঁর বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতে দেখে তাঁর মুখে এই কবিতাটি উচ্চারিত হয়—

ওয়া বিআবী শাব্বাহান নাবী
লাইসা বিআলী শাব্বীহা

অর্থঃ আমার পিতা কোরবান হোক, ইনিতো দেখতে ঠিক রসুলুল্লাহর মতো, আলীর মতো নন।

ইসলাম গ্রহণের পর হজরত আবু বকর আল্লাহ্‌র প্রশস্তিমূলক কবিতাই কেবল পছন্দ করতেন। একদিন কবি লবিদ আবৃত্তি করলেন—

আলা কুল্লু শায়ইম মা খালাল্লাহি বাতিল
ওয়া কুল্লু না'ঈমিল লা মাহালাতা যাইল।

অর্থ: আল্লাহ্‌ ব্যতীত সবকিছু বাতিল। সকল প্রকার নেয়ামত ধ্বংস হয়ে যাবে।

হজরত আবু বকর বললেন, ভুল। আল্লাহ্‌র নেয়ামত অনিঃশেষ, কখনো ধ্বংস হবে না।

তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতা শুনলে লোকেরা মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে যেতো। সফিফায়ে বনী সাদায় তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় বক্তৃতার মাধ্যমেই মানুষের মনোভাব সমাধানমুখী করে দিয়েছিলেন। তাঁর সাধারণ বক্তৃতাগুলোও ছিলো মর্মস্পর্শী। যেমন— আজ প্রথম যৌবনের সুন্দর, কমনীয় ও লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডলগুলো কোথায়? কোথায় সেসকল সুরক্ষিত দুর্গাধিকারী সম্রাটসকল? মহাপ্রতাপশালী বীরপুরুষেরা আজ কোথায় অন্তর্হিত হলো? দ্যাখো, সময়ের বিবর্তন তাদের বলবিক্রমকে উধাও করে দিয়েছে। তাদের শৌর্য-বীর্য এখন শক্তি-সৌন্দর্যহীন। অন্ধকার কবর-গহ্বরই এখন তাদের আশ্রয়স্থল।

কখনো কখনো তিনি ভাবাবেগাহত হয়ে পড়তেন। একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি, ঠিক এখানেই এক বছর আগে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম প্রত্যাদেশবাহক দাঁড়াতেন— এটুকু বলেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অন্য একদিন তিন তিনবার ভাষণ দিতে চেষ্টা করলেন। প্রবল শোকোচ্ছ্বাসের কারণে প্রতিবারই তাঁর বাকরুদ্ধ হলো।

বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের নাম-পরিচয়মূলক জ্ঞান সে যুগে খুবই সমাদৃত ছিলো। হজরত আবু বকর ছিলেন এ বিষয়ের একজন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ। তাঁর এমতো জ্ঞান ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও কাজে লেগেছে। প্রথম দিকে রসুলুল্লাহ স. তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন গোত্রাধিপতির কাছে যেতেন। গোত্রপরিচয় জানা থাকায় তিনি তখন ওই গোত্রের সঙ্গে রসুলুল্লাহ স. এর সম্পর্ক নির্ণয় করে দিতেন। ফলে তারা সচকিত হয়ে যেতো। কথা শুনতো অধিকতর

অভিনিবেশ সহকারে। রসুলুল্লাহ স. তাঁর কবি সাহাবী হজরত হাস্‌সানকে এইমর্মে একবার এমতো আজ্ঞাও করেছেন যে, আবু বকরের কাছে যাও। সে বংশপরিচয়বিশেষজ্ঞ।

স্বপ্নব্যাখ্যাবিশারদও ছিলেন তিনি। রসুলুল্লাহ স. এর পরে তিনিই ছিলেন এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী। ইসলামগ্রহণের আগে একবার খালেদ বিন ওলীদ স্বপ্নে দেখলেন, একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পিতা তাঁকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ইতোমধ্যে সেখানে রসুলুল্লাহ স. উপস্থিত হলেন। তিনি স. তাঁকে কোমর ধরে আগুন থেকে দূরে নিয়ে গেলেন। হজরত আবু বকরকে যখন এই স্বপ্নের কথা জানানো হলো, তখন তিনি বললেন, খালেদ! এ স্বপ্নের মাধ্যমে তোমাকে সত্য পথ দেখানো হয়েছে।

রসুলুল্লাহ স. এর মহাতিরোভাবের কয়েকদিন আগে উম্মতজননী আয়েশা সিদ্দিকা স্বপ্নে দেখলেন, তিনটি চাঁদ এসে তাঁরই প্রকোষ্ঠমধ্যে অবস্থানগ্রহণ করলো। স্বপ্নের কথা তিনি তাঁর মহাসম্মানিত পিতাকে জানালেন। তিনি নিরুত্তর রইলেন। রসুলুল্লাহ স. এর সমাধি রচিত হয়ে গেলে বললেন, এটি হচ্ছে তিনটি চন্দ্রের শ্রেষ্ঠটি।

রসুলুল্লাহ স. কখনো কখনো তাঁকে নিজের দেখা স্বপ্নের কথা বলতেন। যেমন একবার বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, কতকগুলো শাদা ভেড়ার সঙ্গে এসে মিলিত হলো কতকগুলো কালো ভেড়া। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কালো ভেড়াগুলো আরববাসী। প্রথমে তারা আপনার ধর্ম গ্রহণ করবে। পরে তাদের অনুগামী হবে বিপুলসংখ্যক শাদা ভেড়ারূপী অনারব জনতা। তিনি স. বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। ফেরেশতাও আমাকে এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছে।

বাইশ

হজরত আবু বকর সব সময় রসুলুল্লাহর সঙ্গে থাকতে পছন্দ করতেন। রসুলুল্লাহও অনেক বিষয়ে তাঁর পরামর্শ কামনা করতেন। কখনো তিনি

রসুলুল্লাহর কাছ থেকে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর জেনে নিতেন। একবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই আয়াতের মর্মার্থ কী— তোমার আকাঙ্ক্ষা আমল আহলে কিতাবগণের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক ফয়সালা করা হবে না। বরং যারাই মন্দ কাজ করবে, তাদেরকে সে মন্দ কাজের ফল ভোগ করতে হবে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা মন্দ কাজের কী কুফল ভোগ করি? তিনি স. বললেন, আবু বকর! আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করুন! তুমি কি মনোকষ্ট ভোগ করো না? তোমার উপরে কি বিপদ আপদ পতিত হয় না?

তিনি প্রত্যেক আয়াতের প্রকৃত মর্ম ও তার অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। একবার তিনি এক জনসমাবেশে ভাষণ দান করতে গিয়ে বললেন, ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা তো এই আয়াতখানি সচারাচর আবৃত্তি করে থাকো— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রত্যেককে নিজেদের জন্য দায়ী করা হবে। যে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে, সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা নিজেরা হেদায়েতের পথে চলো'। আমি স্বয়ং রসুলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি, অসিদ্ধ কাজ হতে দেখে নিরবতা অবলম্বন করলে সকলকে আল্লাহ্‌র আযাব ভোগ করতে হবে। সুতরাং কেউ একথা মনে কোরো না যে, অপরের সংশোধনপ্রচেষ্টা ছেড়ে দিতে হবে।

হাদিস বর্ণনার সুযোগ তিনি তেমন পাননি। সময় ছিলো কম। রসুলুল্লাহ স. এর মহাতিরোভাবের পরে পৃথিবীতে তিনি ছিলেন মাত্র সোয়া দুই বৎসর। কিন্তু জরুরী হাদিসগুলোর প্রচারের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জাকাতের নেসাববিষয়ক হাদিসসমূহ তিনি সকল প্রদেশে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, নির্ধারিত হারের বেশী কেউ দিবেন না।

'খলিফা কুরায়েশদের মধ্য থেকে হবে' এই হাদিসটি তিনিই বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই বর্ণনার কারণেই সেদিন জনতার প্রতর্ক পরিহৃত হয়েছিলো। দাফন সম্পর্কিত মতভেদও দূর হয়েছিলো তাঁর বর্ণিত এই হাদিসের দ্বারা— 'নবীগণ যেখানে দেহরক্ষা করেন, সেখানেই হয় তাঁদের সমাধি'। যখন নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমাতুয্‌ যাহরা রা. এবং হজরত আব্বাস রা. উত্তরাধিকার দাবি করেন, তখন তিনিই সবাইকে এই হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দেন— 'আমাদের (নবীগণের) উত্তরাধিকারী নেই। আমরা যা রেখে যাই, তা সদকা।'

খেলাফত আসে নবুয়তের সিঁড়ি বেয়ে। তবুও এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। তিনি মানুষের কাছে এ দু'টোর পার্থক্যরেখা সুস্পষ্ট করে দেন। বলেন, আল্লাহ্‌র রসুল নিষ্পাপ ছিলেন। ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশানুসারী। আমি সাধারণ মানুষ। আমি সঠিক পথে চললে তোমরা আমার অনুসরণ কোরো, আর ভুল পথে গেলে সংশোধন করে দিয়ো।

একবার তিনি এক মুসলমানের উপরে খুবই রাগান্বিত হলেন। হজরত আবু বাররা সালমা বললেন, হে রসুলের খলিফা! আদেশ করুন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেই। হজরত আবু বকর নিরব হয়ে গেলেন। পরে রাগ কমে গেলে তাঁকে বললেন, আবু বাররা! ওই সময় যদি হ্যাঁ বলতাম, তবে তুমি কি লোকটির মস্তকচ্ছেদন করতে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। খলিফা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসুলুল্লাহর পরে এরকম ক্ষমতা কারো নেই।

একবার এক লোক তাঁকে আল্লাহ্‌র খলিফা বলে সম্বোধন করলেন। তিনি বললেন, ওরকম বোলো না। আমি আল্লাহ্‌র খলিফা নই, রসুলের খলিফা। তাঁর আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা হলে তিনি প্রথমে কোরআনের বিধানানুসারে মামলানিষ্পত্তির চেষ্টা করতেন। কোরআনপাকে বিধান না পেলে হাদিস অনুসারে বিধান দিতেন। সেখানেও সমাধান না পেলে বিজ্ঞ মুসলমানদের অভিমত সংগ্রহ করতেন। ব্যক্তিগত মতামত পরিহার করে চলতেন। বলতেন, যে বিষয়ে আমার জানা নেই, সে বিষয়ে আমি ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করতে পারি না। যদি করি তবে মাটি-আসমান কেউ আমাকে আশ্রয় দিবে না।

ইবনে সিরিন বলেন, অজ্ঞাত বিষয়ে মতামত প্রকাশের ব্যাপারে হজরত আবু বকর ভয় পেতেন। অবশ্য নিরুপায় হলে কিয়াস করতে বাধ্য হতেন। একবার তাঁর সামনে এমন একটি সমস্যা উপস্থাপন করা হলো, যার সমাধান কোরআন হাদিস কোথাও পাওয়া গেলো না। বাধ্য হয়ে তিনি কিয়াস করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন, যদি আমার এই কিয়াস ভুল হয়, তাহলে তা হবে আমারই দুর্বলতা। আর যদি সঠিক হয়, তবে তা হবে সরাসরি আল্লাহ্‌র অনুকম্পা। আল্লাহ্‌ সকাশে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন সকল শুভগুণসম্পন্ন। ইসলামগ্রহণের পর তিনি অধিকতর আলোকিত হয়ে উঠেন। হতে থাকেন উত্তরোত্তর অধিক প্রোজ্জ্বল। তিনি ছিলেন সচ্চরিত্র, সজ্জন, সরলচিত্ত, কোমলপ্রাণ, দয়াবান,

সত্য ও সততাধিকারী। ছিলেন দানশীল, দরিদ্র ও পতিবিহীনদের আশ্রয়স্থল, স্বজনবৎসল ও অতিথিপরায়ণ।

আল্লাহ্ভীতি ছিলো তাঁর সত্তাসম্পৃক্ত একটি বৈশিষ্ট্য। একবার এক লোক একটি অজানা পথে যেতে যেতে তাঁকে বললো, এ পথে পড়বে দুশ্চরিত্র লোকদের বসবাস। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ফিরে যেতে যেতে বললেন, আমি এ পথের পথিক হতে পারি না।

একবার এক গোলাম তাঁকে হাদিয়া হিসেবে কিছু খাদ্যদ্রব্য দিলো। তিনি আহার করলেন। গোলাম বললো, হে আমিরুল মু'মিনিন! এই খাবার আমি কীভাবে পেয়েছি, বলবো? তিনি বললেন, বলো। গোলাম বললো, ইসলামপূর্ব যুগে আমি ভাগ্যগণনা সম্পর্কে কিছু না জানলেও এক লোকের ভাগ্য গণনা করে দিয়েছিলাম। কাকতালীয়ভাবে তা ফলেও গিয়েছিলো। আজ তার সঙ্গে দেখা হলে সেদিনের পারশ্রমিকরূপে সে এই খাদ্য সামগ্রী আমাকে দিলো।

তার কথা শুনে হজরত আবু বকর গলায় আঙুল দিয়ে ভক্ষিত খাদ্য বমি করে ফেলে দিলেন। বললেন, যে শরীর হারামখাদ্যপুষ্ট, সে শরীর হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

হজরত আবু বকর কর্কশ ও অশ্লীল কথা বলতেনই না। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, অর্থবিত্ত, প্রতিপত্তি সম্পর্কে ছিলেন নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত। মুসলমানদেরকে দলাদলি থেকে রক্ষা করার জন্যই তিনি খলিফা হওয়ার প্রস্তাবটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। পরে অনেকবার বলেছেন, কেউ এই গুরুভার নিতে চাইলে তিনি সানন্দে দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন।

হজরত রাফে তায়ী রা. বলেছেন, একবার আমি খলিফা মহোদয়ের কাছে সদুপদেশপ্রার্থী হলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার প্রতি রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন। নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, জাকাত ও হজ আদায় করো। কখনো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধিকারী হতে চেষ্টা কোরো না। নেতার দায়িত্ব অনেক বেশী। মহাবিচারের দিবসে নেতাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে খুবই কড়াকড়িভাবে। তাদের আমলনামাও হবে সুদীর্ঘ।

একবার তিনি পানি পান করবেন বললেন। পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে তাঁকে পান করতে দেওয়া হলো। পানপাত্রটি মুখের কাছে নিয়ে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। সেখানে উপস্থিত সকলেই দুঃখভারাক্রান্ত হলেন।

পরে তাঁরা যখন কান্নার কারণ জানতে চাইলেন, তখন তিনি বললেন, একদিন আমি রসুলুল্লাহর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তিনি হঠাৎ কোনো কিছুর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন 'দূর' 'দূর'। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কাকে দূর দূর বলছেন। আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তিনি স. এরশাদ করলেন, দুনিয়া আকর্ষণীয় রূপ ধরে আমার সামনে এসেছিলো। তাড়িয়ে দিলাম। আজ মধু মিশানো পানি দেখে আমার মনে হলো, আমিও হয়তো দুনিয়ার মোহে মগ্ন হয়ে যাবো।

হজরত আবু বকর তাঁর বিপুল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে ফেলেন।

তেইশ

অত্যন্ত শিষ্ট ও নম্র স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন তিনি। সাধারণ কাজ করতেও লজ্জাবোধ করতেন না। কোনো কোনো সময় নিজেই ছাগল চরাতেন। প্রতিবেশীদের ছাগল দোহন করে দিতেন। তিনি খলিফা হওয়ার পর এক বালিকা বলে উঠলো, হায়! এখন থেকে আমার ছাগল দোহন করে দিবে কে? হজরত আবু বকর একথা শুনে বললেন, কেনো, আমি। খলিফা হয়েছি তো কী হয়েছে।

তিনি ছিলেন বস্ত্র ব্যবসায়ী। খলিফা হওয়ার পরেও তিনি কাপড়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে হজরত ওমর ও হজরত আবু উবায়দার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় চললেন? তিনি বললেন, বাজারে। তাঁরা বললেন, হে খলিফাপ্রবর! আপনি তো এখন শাসনকর্তা। ব্যবসার সময় সুযোগ তো আপনি পাবেনই না। ফিরে চলুন, আমরা পরামর্শক্রমে আপনার ভাতা নির্ধারণ করে দিবো।

রসুলুল্লাহ স. আজ্ঞা করেছেন, যে পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলিধূসরিত হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালা তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন। তিনি এই হাদিসের উপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেনাবাহিনীর যুদ্ধ যাত্রাকালে তাদের সাথে কিছুদূর পায়ে হেঁটে চলতেন। সেনাপতিকে বাহন থেকে

নামতে দিতেন না। বলতেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় আমার পা দু'টোকে ধূলিমলিন হওয়ার সুযোগ দাও।

সকলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবিগলিত হতো। তিনি লজ্জিত হতেন। বলতেন, মানুষ আমাকে অতিভক্তি করছে। কেউ প্রশংসা করলে বলতেন, হে আমার প্রভুপালক আল্লাহ্‌! তুমি আমার অবস্থা আমার চেয়ে ভালো জানো। আর আমি আমার অবস্থা জানি ওদের চেয়ে ভালো করে। তুমি ওদের ধারণার চেয়ে আমাকে অধিক উত্তম করে দাও। আর আমার গোনাহ্‌গুলো মাফ করে দাও। আর মানুষের অযথার্থ প্রশংসা-প্রশস্তির জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত কোরো না।

আহমিকাক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সদা সংযত থাকতেন। কখনো প্রচার করতেন এই হাদিসখানি— আল্লাহ্‌র রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ পরিধেয় বস্ত্র মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌তায়ালা তার দিকে অনুকম্পাদৃষ্টি প্রদান করবেন না।

তিনি তাঁর সমুদয় সঞ্চিত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে ফেলেন। নিগৃহীত ক্রীতদাস-দাসীদেরকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। যেমন মুক্ত করে দেন বেলাল, আমের ইবনে ফাহিরা, নাজিরা, জারিয়া, বনি মুমিন, নাহদিয়া বিনতে নাহদিয়া প্রমুখ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এধরনের অর্থব্যয় ছিলো খুবই মর্যাদামণ্ডিত একটি বিষয়। কোরআন মজিদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ খরচ করেছে এবং লড়াই করেছে, তারা সাধারণ মুসলমান নয়। বরং পরে যারা সম্পদ ব্যয় করেছে, যুদ্ধ করেছে, তাদের তুলনায় পূর্ববর্তীরা উত্তম'।

রসুলুল্লাহ স. তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে বলেছেন, আমি আবু বকরের সম্পদ দ্বারা যেমন উপকার পেয়েছি, সেরকম উপকার অন্য কারো সম্পদ দ্বারা পাইনি। দৈহিক ও আর্থিক দিক থেকে আবু বকরের চেয়ে অধিক সহায়তা আর কেউ করেনি। তাঁর স. এমতো উক্তি শুনে হজরত আবু বকর অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! আমার জীবন ও সম্পদ আপনারই।

দানশীলতার ক্ষেত্রে হজরত ওমর বার বার তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করতে চেষ্টা করতেন। পারতেন না। তবুক যুদ্ধের সময় হজরত ওমর অনেক মালামাল নিয়ে রসুলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। রসুলুল্লাহ স. বললেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছো? তিনি বললেন, মোট সম্পদের অর্ধেক। এরপর হজরত আবু বকর উপস্থিত হলেন তাঁর অনুদান সম্ভার নিয়ে। সেগুলো অত্যল্প পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো। রসুলুল্লাহ স. বললেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু রেখে এসেছো কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে। হজরত ওমর এবারও পরাজয় স্বীকার করলেন। বললেন, আমি কখনোই তাঁকে অতিক্রম করতে পারবো না।

গোপন ও প্রকাশ্য দান উভয়ই বৈধ। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— '(যদি প্রকাশ্য) দান করো, তবে তা উত্তম। আর যদি গোপনে দরিদ্রদেরকে দাও, তা-ও উত্তম'। হজরত আবু বকর গোপনে দান করতে ভালোবাসতেন। একবার রসুলুল্লাহর কাছে গোপনে কিছু সম্পদ হাজির করে বললেন, দয়া করে গ্রহণ করুন। আল্লাহ্র দেওয়া আরও কিছু আমানত আমার কাছে আছে।

তাঁর দানশীলতা জারি ছিলো তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। অন্তিম মুহূর্তেও তিনি দরিদ্র জনতার জন্য তাঁর সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ দানের অসিয়ত করে যান।

মানবসেবা ছিলো তাঁর প্রিয় কাজ। তিনি প্রতিবেশীদের গৃহকর্মে সাহায্য করতেন। রুগ্নদের চিকিৎসা ও সেবাযত্ন করতেন। বৃদ্ধ ও দুর্বলদের দেখাশোনা করতেন। শহরের এক প্রান্তে এক অসহায় বৃদ্ধা বাস করতো। অতি প্রত্যুষে তাঁর জরুরী গৃহকর্মসমূহ সেরে দিয়ে নামাজে যেতেন। হজরত ওমরও ওই গৃহে বৃদ্ধার প্রয়োজনীয় কাজ করে দেওয়ার জন্য যেতেন। কিন্তু দেখতেন, কে যেনো আগেই তার কাজ করে দিয়ে যায়। একদিন দেখতে পেলেন, এক লোক দ্রুত বৃদ্ধার বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছে। অতিদ্রুত হেঁটে তাঁর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন, তিনি আবু বকর। বললেন, হে মহামান্য খলিফা! কখনোই আপনাকে আমি পশ্চাদবর্তী করতে পারবো না।

তাঁর আর একটি মহৎ গুণ ছিলো অতিথিপরায়ণতা। এক রাতে তিনি কয়েকজন আসহাবে সুফ্ফাকে নিমন্ত্রণ করলেন। পুত্র আবদুর রহমানকে বলে গেলেন, মেহমানেরা এলে খাইয়ে দিও। আমি রসুলুল্লাহর দরবারে

গেলাম। যথাসময়ে মেহমানেরা এলেন। আবদুর রহমান আহার্যসামগ্রী উপস্থিত করার উদ্যোগ নিলে তাঁরা বললেন, গৃহকর্তা আসুন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আহার করবো। হজরত আবু বকর বিলম্বে বাড়ি ফিরলেন। মেহমানদেরকে খাওয়ানো হয়নি দেখে আবদুর রহমানের উপর প্রচণ্ড রাগ করলেন। আবদুর রহমান বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে ছিলেন। ভয়ে ভয়ে বাইরে এলেন। বললেন, জিজ্ঞেস করে দেখুন। আমি বার বার তাঁদেরকে খেতে অনুরোধ করেছি কিনা। মেহমানেরা তাঁর কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিলেন। হজরত আবদুর রহমান বলেছেন, সে বার আমাদের খাদ্য এতো বেশী বরকতময় হয়েছিলো যে, কিছুতেই তা শেষ করতে পারলাম না। রসুলুল্লাহর মহান দরবারেও অনেক খাদ্য হাদিয়ারূপে প্রেরণ করলাম।

তাঁর জীবনপ্রণালী ছিলো সরল ও অনাড়ম্বর। মোটা কাপড় পরতেন। পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতার সাথে সাধারণ মানের খাদ্য গ্রহণ করতেন। খলিফা হওয়ার পরে হন অধিকতর সরল ও সাধারণ। একবার উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকাকে বলেন, খেলাফতের দায়িত্ব স্কন্ধে আপতিত হওয়ার পর আমি সাধারণ খাবার ও মোটা কাপড় পরে দিন কাটিয়েছি। খেলাফত লাভের পূর্বে অতি দানের কারণে কখনো কখনো তাঁকে একধারে দু' তিন দিন অনাহারে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি তাঁর দুরাবস্থার কথা প্রকাশ হতে দেননি। একদিন রসুলুল্লাহ স. মসজিদে উপস্থিত হয়ে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে দেখতে পেলেন। তাঁরা অভুক্ত এ কথা বুঝতে পেরে বললেন, আমিও অনাহারী। হজরত আবু হাতেম আনসারী একথা শুনতে পেয়ে তিনজনকেই তাঁর বাড়িতে নিয়ে তাঁদেরকে আহার করালেন।

হজরত আবু বকর তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন উম্মতজননী হজরত আয়েশা। মদিনার উপকণ্ঠের একটি ভূখণ্ডকে তিনি তাঁর নামে হেবা করে দেন। পৃথিবী পরিত্যাগকালে ভাবেন, এতে করে উত্তরাধীকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হজরত আয়েশাকে কাছে ডেকে এনে বলেন, পুত্রী! তুমি তো আমার সর্বাধিক স্নেহের পাত্রী। তোমার ওই জমিটিতে তুমি তোমার সকল ভাই-বোনকে শরীক করে নিয়ো। বলাবহুল্য, জননী আয়েশা সিদ্দিকা সেরকমই করেছিলেন।

হজরত আবু বকর প্রায় সারারাত নামাজে কাটাতেন। অনেক রোজা রাখতেন। তাঁর অন্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে ও ভালোবাসায় সদাপ্রকম্পিত থাকতো। নামাজে দাঁড়ালে হয়ে যেতেন শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডবত। অনেক সময় ধরে রোদন করতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী-পাখি দেখে আল্লাহ্‌র মহত্ব-মহিমার কথা স্মরণ করতেন। কখনো বৃক্ষকুলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলতেন, হায়! আমি যদি বৃক্ষের লতাগুল্ম হতাম। তাহলে পরকালে হিসাবের সম্মুখীন হতে হতো না। পাখির কুজন শুনে উদাসীন হয়ে যেতেন। বলতেন, হে বিহঙ্গকুল! তোমরা কী আনন্দে কিচিরমিচির করছো। তোমাদের কোনো হিসাব-নিকাশ নেই।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় তাঁর দু'চোখ বেয়ে নেমে আসতো অশ্রুনির্ঝরণী। কখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন।

পুণ্যকর্মের কোনো সুযোগই তিনি ছেড়ে দিতেন না। একদিন রসুলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রোজা রেখেছে? হজরত আবু বকর বললেন, আমি। তিনি স. পুনঃপ্রশ্ন করলেন, জানাযায় যোগদান করেছে কে? তিনি বললেন, আমি। অন্নহীনকে খাদ্য দিয়েছে কে? রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়েছে কে? সকল প্রশ্নের উত্তরে কেবল হজরত আবু বকর হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন। তখন রসুলুল্লাহ স. বললেন, যে লোক এতোগুলো নেক কাজ করে, সে লোক নিশ্চয় বেহেশতি।

তাঁর ভাতার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনে সায়াদ বলেছেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাঁকে দু'খানা করে চাদর দেওয়া হতো। সেগুলো পুরনো হয়ে গেলে সেগুলো ফেরত দিয়ে নতুন এক জোড়া চাদর নিতে পারতেন। সফরের সময় তাঁকে যাত্রীবাহী উট খরিদ করে নিতে হতো। আর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার আগে পরিবার পরিজনের জন্য যেমন খরচ করতেন, সেই পরিমাণ গ্রহণ করতেন বায়তুল মাল থেকে।

দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। ছিলেন কৃশকায় ও দীর্ঘদেহী। মুখাবয়ব ছিলো অমাংসল। গাত্রবর্ণ গৌর। প্রশস্ত ও উন্নত ললাটধারী। নাসিকা উন্নত। চোখ ছিলো কোটরাগত, কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু উজ্জ্বল। কেশ ও শ্মশ্রু ছিলো মেহেদিরঞ্জিত।

চারটি বিবাহ করেছিলেন। দু'টি ইসলাম গ্রহণের আগে এবং দু'টি পরে। ইসলামপূর্ব সময়ের স্ত্রীদ্বয়ের নাম ছিলো কাতিলা ও উম্মে রুমান।

কাতিলা ছিলেন নবী আমের গোত্রের কন্যা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। উম্মে রুমান ছিলেন মালিক ইবনে কানানার বংশের মেয়ে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতও করেন। ৬ হিজরীর জিলহজ মাসে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর ইন্তেকালের পর হজরত আবু বকর বিবাহ করেন হজরত আসমা বিনতে উমায়েসকে। তাঁর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন খারিজা বিনতে হাবীবা।

তিন কন্যা ও তিন পুত্রের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন উম্মে রুমানের সন্তান। ৫৩ হিজরীতে তিনি পরলোকগমন করেন। কাতিলার ঘরে জন্ম নেন আবদুল্লাহ। তিনি রসুলুল্লাহ স. এর সঙ্গে তায়েফ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন পায়ে তীর বিদ্ধ হয়েছিলো। ওই জখম নিয়েই ১১ হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি শাহাদতবরণ করেন।

হজরত আসমা বিনতে উমায়েসের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন তৃতীয় পুত্র মোহাম্মদ। আর তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা আসমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিলো হজরত যোবায়েরের সঙ্গে। দ্বিতীয় কন্যা ছিলেন উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা। তিনি ছিলেন রসুলুল্লাহর প্রিয়তম সহধর্মিণী। ছিলেন বিজ্ঞ ও বিদুষী— হাদিসশাস্ত্রবিশারদ। উম্মতজননী।

তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন তাঁর মহাতিরোধানের পরে।

চব্বিশ

কোরআনুল করিমের বিভিন্ন আয়াতে হজরত আবু বকরের প্রশস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সুরা তওবায় বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো, তবে স্মরণ করো আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাকে বহিষ্কার করেছিলো এবং সে ছিলো দুই জনের একজন যখন তাহারা গুহার মধ্যে ছিলো, সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিলো, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর তাঁর দয়া বর্ষণ করেন। যাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়'।

এই আয়াতে রসুল স. এর প্রধান সাহাবী হজরত আবু বকরের বিশেষ মর্যাদার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। একবার তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সে তখন

তার সঙ্গীকে বলেছিলো' এরপর বলা হয়েছে (রসুল স. বলেছিলেন) 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। এভাবে এখানে হজরত আবু বকরের রসুলের সঙ্গী হওয়া এবং আল্লাহ্র সঙ্গী হওয়ার বিষয়টিকে এখানে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র সঙ্গে থাকার বিষয়টি অন্য কারো সঙ্গে থাকার মতো নয়। আল্লাহ্পাকের সত্তা ও গুণাবলীর মতো তাঁর সঙ্গে থাকার বিষয়টিও আনুরূপ্যহীন (বেমেছাল)। শহীদ শায়েখ মির্যা মাজহারে জানে জানা র. বলেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিকের মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবার জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক দশ আউকিয়া রূপার বিনিময়ে উমাইয়া ইবনে খালফের কাছ থেকে হজরত বেলালকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দিয়েছিলেন। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরা লাইলের এই আয়াত— 'অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির'। অর্থাৎ উমাইয়া ইবনে খালফ ও হজরত আবু বকরের আমল ছিলো পৃথক প্রকৃতির।

মুজাহিদ বর্ণনা করেন, যখন 'ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইউসল্লুনা আলান্নাবিয়্যী' এই আয়াত নাজিল হলো, তখন হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শুধু এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা আপনার সঙ্গে আমাকে সম্পৃক্ত করেননি। তখন অবতীর্ণ হলো 'হুয়াল্লাজি ইউসল্লি আলাইকুম ওয়া মালায়িকাতাহু'

ইমাম জয়নুল আবেদীন থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত আলীর শানে— 'আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করে দিবো, তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে'। এই আয়াতের মর্মার্থ হবে মূর্খতার যুগে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে আন্তর্কলহ ছিলো, শেষ রসুলের মহাআবির্ভাবের মাধ্যমে তা মিটিয়ে দেওয়া হলো। ঈর্ষা-বিদ্বেষের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হলো ভ্রাতৃসুলভ প্রেম-ভালোবাসা (দৃষ্টান্ত— আবু বকর, ওমর, আলীর পারস্পরিক প্রেমবন্ধন)।

হজরত আলী থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, সুরা আহক্বাফের ১৫-১৬ সংখ্যক আয়াত (আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি... তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সত্য) অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দিকের শানে।

ইবনে উয়াইনা থেকে ইবনে আসাকির আরও বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা রসুল স. সমীপে সকল মুসলমানের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্ত হজরত আবু বকর ছিলেন অসন্তোষমুক্ত। এ সম্পর্কে সুরা তওবার ৪০ সংখ্যক আয়াতখানি দেখা যেতে পারে।

পঁচিশ

হাদিস শরীফেও হজরত আবু বকর সিদ্দীকের বহুবিধ প্রশস্তি প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন— বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. একদিন বললেন, যে ব্যক্তি এক জোড়া কোনো সামগ্রী আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তাকে জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! এ পথে এসো। এ দরজাটি অতি সুন্দর। সুতরাং শুনে নাও, নামাজীকে নামাজের দরজা থেকে, মুজাহিদকে জেহাদের দরজা থেকে, সদকা প্রদানকারীকে সদকার দরজা থেকে, রোজাদারকে রোজার দরজা থেকে নাম ধরে ডাকা হবে। হজরত আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! কোনো ব্যক্তিকে সকল দরজা থেকে ডাকা হবে কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আমি মনে করি তুমিও তাদের একজন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ ও হাকেমের এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার সাহচর্য ও সম্পদ দ্বারা আমাকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত করেছে, সে আবু বকর। যদি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম। কিন্তু ইসলামে ধর্মভ্রাতৃত্ববন্ধনই যথেষ্ট।

হজরত আবু দারদা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রসুলুল্লাহর মহাপবিত্র সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবু বকর এলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ওমরের সঙ্গে আমার কিছুটা মনোমালিন্য হয়েছে। আমি অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু ওমর আমাকে ক্ষমা

করতে চায় না। অগত্যা আপনার শরণাপন্ন হলাম। তিনি স. তিন বার বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন। ওদিকে ওমর অনুতপ্ত হয়ে আবু বকরের বাড়িতে যান। সেখানে তাঁকে না পেয়ে চলে আসেন পবিত্র এই দরবারে। তাঁকে দেখে রসুলুল্লাহ রাগান্বিত হলেন। আবু বকর বুঝতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! দোষটা আমারই। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা যখন আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তোমরা আমাকে বিশ্বাস করোনি কিন্তু আবু বকর বিশ্বাস করেছে সর্বান্তকরণে। সাহায্য করেছে জীবন ও সম্পদ দিয়ে। আর তোমরা তাকে বর্জন করতে চাও!

ইবনে আসাকিরের এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আকীল ইবনে আবু তালেব এবং হজরত আবু বকরের মধ্যে একবার কথা কাটাকাটি হলো। হঠাৎ হজরত আবু বকর ভাবলেন, তিনি তো রাসুলুল্লাহর নিকটাত্মীয়। একথা ভেবে তিনি নিরব হয়ে গেলেন। হজরত আকীল এ বিষয়ে রসুলুল্লাহর দরবারে নালিশ করলে তিনি স. উষ্মা প্রকাশ করলেন। দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, আমার দোস্তকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। নিজেদের দিকে তাকাও। আল্লাহ্র কসম! তোমাদের সকলের দরজা অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু আবু বকরের দরজা আলোকিত। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। আবু বকর বলেছে, আমি সত্য। তোমরা আমার সাথে কৃপণতা করেছো, আর আবু বকর আমার জন্য অর্থ ব্যয় করেছে। তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করেছো, আবু বকর করেছে আনুগত্য। আবু ইয়ালা তাঁর পুস্তকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, একদিন আমি নামাজ শেষে মসজিদে দোয়া করছিলাম। রসুল স. আবু বকর ও ওমরকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এলেন। বললেন, যে শুদ্ধ সুন্দর করে কোরআন পাঠ করতে চায়, সে যেনো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের পাঠকণ্ঠ অনুসরণ করে। এরপর আমি বাড়ি এলাম। কিছুক্ষণ পর আবু বকর আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এলেন। একটু পরে এলেন ওমর। তিনি আবু বকরের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি সকল উত্তম কাজে সকলের অগ্রণী।

একদিন রসুলুল্লাহ স. বললেন, ভালো অভ্যাস তিন শত সাতটি। আল্লাহ্তায়ালা কাউকে জান্নাত দিতে চাইলে তাকে যে কোনো একটি ভালো অভ্যাস দান করেন। হজরত আবু বকর আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র

প্রিয়তম রসুল! ঐ ভালো অভ্যাসগুলোর কোনো একটি কি আমাকে দেওয়া হয়েছে? তিনি স. বললেন, সব কয়টিই দেওয়া হয়েছে। সুলায়মান ইবনে ইয়াসির থেকে ইবনে আসাকির।

একদিন রসুলুল্লাহ স. তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে একটি জলাশয়ের পাড়ে উপনীত হয়ে বললেন, তোমরা নিজ নিজ সাথী বেছে নাও। সকলেই নির্দেশ পালন করলেন। দেখা গেলো, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেবল তিনি স. এবং হজরত আবু বকর। তিনি স. তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, তুমি আমার বন্ধু নও, সাথী (আমাদের দু'জনের বন্ধু আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা) । ইবনে আসাকির।

ইবনে আসাকির ইয়াকুব আনসারীর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ স. এর পবিত্র সভায় সাহাবীগণ গায়ে গায়ে মিলিয়ে বসতেন। না আসা পর্যন্ত হজরত আবু বকরের জায়গা খালি পড়ে থাকতো। সেখানে কেউ বসতেন না।

রসুলে আকবর স. নির্দেশ করেছেন, আবু বকরকে ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকল উম্মতের জন্য ওয়াজিব। হজরত আনাস থেকে ইবনে আসাকির।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে করিম স. বলেছেন, সকল লোকের হিসাব নেওয়া হবে। হিসাব নেওয়া হবে না কেবল আবু বকরের।

ইবনে আবী হাতেম ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে জাবের বলেছেন, আমি একবার রসুলুল্লাহ স. এর সম্মুখে 'ইয়া আইয়াতুহান্ নাফসুল মুৎমাইন্না' (হে প্রশান্ত প্রবৃত্তিধারী!) এই আয়াত পাঠ করলাম। সেখানে উপস্থিত আবু বকর বললেন, আহা! কী সুন্দর আহ্বান। তিনি স. বললেন, তোমার পরলোক যাত্রারপ্রাক্কালে ফেরেশতা তোমাকে এভাবে সম্বোধন করবে।

ইবনে আবী হাতেম, আমের বিন আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, 'ওয়ালাও আন্না কাতাবনা আলাইহিম আনিক্বতুলু আনফুসাকুম..' (যদি তাহাদিগকে আদেশ দিতাম, তোমরা নিজদিগকে হত্যা করো ....সুরা নিসা আয়াত ৬৬) এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত আবু বকর বললেন, আপনি হুকুম করলে আমি নিজেকে কতল করে ফেলবো। তিনি স. বললেন, ঠিকই বলেছো।

হজরত হোজায়ফা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুলে করিম স. একবার এরশাদ করলেন, বেহেশতে খোরাশানের উটের মতো অনেক পাখি থাকবে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! তাহলে তো অতি উত্তম হবে। তিনি স. বললেন, ভক্ষণকারীরা হবে তদপেক্ষা উত্তম। যেমন তুমি।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুলুল্লাহ স. হজরত আবু বকরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি যেমন গুহামধ্যে আমার সাথী হয়েছিলে, তেমনি সাথী হবে হাউজে কাওছারের পাশে। রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, মহাপ্রলয়কালে প্রথমে আমার কবর উন্মুক্ত হবে। তারপর আবু বকরের। তারপর ওমরের। আমার উম্মতের মধ্যে আবু বকরই সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে।

তিনি স. আরো বলেছেন, বেহেশেতে আমার দু'জন উজির আছেন— জিব্‌রাইল ও মিকাইল। আর আমার পৃথিবীর উজিরও দু'জন— আবু বকর ও ওমর।

এককভাবে হজরত আবু বকরের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে ১৮১টি হাদিসে। আর হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের গুণাবলী সম্পর্কে যৌথভাবে হাদিস বর্ণিত হয়েছে ৮৮টি। ত্রয়ী খলিফার সম্মিলিত বর্ণনাসম্ভূত হাদিসের সংখ্যা ১৭, খলিফা চতুষ্টয় সম্পর্কে এককবিবৃত হাদিস ১৪টি। আর সাহাবা ও খলিফাগণকে নিয়ে বর্ণিত হয়েছে ১৫টি হাদিস। অতএব, হজরত আবু বকরের উল্লেখ রয়েছে এরকম হাদিসের সংখ্যা দাড়ালো ৩১৬। অন্যান্য হাদিসেও হজরত আবু বকরের উল্লেখ রয়েছে পরোক্ষে অথবা ইঙ্গিতার্থে। সেগুলো থেকে অল্প কয়েকটি উল্লেখ করা হলো এখানে।

১. এরূপ কোনো লোককে আমি ইসলামের আমন্ত্রণ জানাইনি, যে প্রথমে কিছুটা হলেও ইতস্ততঃভাব প্রকাশ করেছে, কিন্তু আবু বকর ইসলাম গ্রহণ করেছে কণামাত্র ইতস্ততঃ না হয়ে। ইবনে ইসহাক।

২. নবী ব্যতীত আবু বকরের চেয়ে উত্তম কোনো লোকের উপরে সূর্য উদিত হয়নি এবং অস্তও যায়নি। আবদ ইবনে হুমাইদ।

৩. নবীগণ ব্যতীত মানুষের মধ্যে আবু বকরই সর্বোত্তম। তিবরানী।

৪. আবু বকর খারাপ কিছু করুক আল্লাহ্‌ তা চান না। তিবরানী।

৫. হজরত আমর ইবনে আস বলেছেন, একদিন আমি আল্লাহ্‌র রসুলকে এইমর্মে প্রশ্ন করলাম, আপনি কাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন? তিনি স. বললেন, আয়েশাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি স. বললেন, তার পিতাকে।

৬. হজরত আলী বলেছেন, একদিন আমি যখন রসুলুল্লাহ স. সমীপে উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে আবু বকর ও ওমর উপস্থিত হলেন। তাঁদের প্রস্থানের পর রসুল স. বললেন, ওই দু'জন হবে প্রবীণ জান্নাতিদের নেতা। কথাটা তাদেরকে জানতে দিয়ো না।

৭. আমার অনুসারীদের প্রতি সর্বাধিক মমতাপরবশ আবু বকর। তিরমিজি, আহমদ।

৮. আবু বকর বেহেশতের জন্যই। আসহাব-ই-সুনান।

৯. দিগন্তস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে যেমন করে তোমরা দৃষ্টিপাত করো, তেমনি করে চেয়ে দেখবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতিদেরকে। তাদের মধ্যে থাকবে আবু বকর ও ওমর।

১০. মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ সভামধ্যে সাধারণত রসুলুল্লাহর দিকে সরাসরি দৃষ্টিপাত করতে পারতেন না। দৃষ্টিপাত করতেন কেবল হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর। তিনিও তাঁদের দিকে তাকাতেন। কখনো কখনো স্মিতহাস্যবিনিময় হতো। তিরমিজি।

১১. একবার আল্লাহ্‌র রসুল স. ডান হাতে হজরত আবু বকরকে এবং বাম হাতে হজরত ওমরকে জড়িয়ে ধরে মসজিদে প্রবেশ করলেন। বললেন, মহাবিচার দিবসে আমরা এভাবে উপস্থিত হবো। তিরমিজি, হাকেম, তিবরানী।

১২. মহাবিচারের দিন পৃথিবীকে প্রথমে আমার জন্য, তারপর আবু বকরের জন্য, তারপর ওমরের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। তিরমিজি, হাকেম।

১৩. একদিন তিনি স. আবু বকর ও ওমরের দিকে চেয়ে বললেন, এরা দু'জন আমার শ্রুতি ও দৃষ্টি। তিরমিজি, হাকেম।

১৪. আল্লাহ্‌র রসুল স. বলেছেন, আবু বকর ব্যতীত অন্য সকলের ঋণ আমি পরিশোধ করেছি। তার নিকট আমি অনেক ঋণী। পরবর্তী পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ তাকে বিনিময় দিবেন। তিরমিজি।

১৫. কবি সাহাবী হজরত হাস্‌সান ইবনে সাবেতকে রসুলে আকদাস স. একবার বললেন, তুমি আবু বকরের প্রশংসাসূচক কোনো কবিতা রচনা করেছো কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, পাঠ করো। তিনি আবৃত্তি করলেন—

সম্মানিত গুহার দুইজনের একজন, যখন গুহার চারপাশে সুউচ্চ চূড়ায় শত্রুরা ছিলো বিচরণরত। তিনি আল্লাহ্‌র রসুলের প্রিয় সহচর। আর সকলেই একথা জানে যে, তাঁর কাছে তিনিই সবচেয়ে উত্তম।

রসুলে আকদাস স. হেসে ফেললেন। তাঁর পবিত্র দন্তরাজি প্রায় পূর্ণ বিকশিত হলো। বললেন, হাস্‌সান! তুমি ঠিকই বলেছো। তুমি যেরকম বলেছো, সে সেরকমই। আবু সাঈদ, হাকেম।

১৬. আবু আল আলভি দাওমী বলেছেন, একবার রসুলে আকদাস স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। মান্যবর আবু বকর ও ওমর এলেন। তিনি স. তাদেরকে দেখিয়ে বললেন, সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! তিনি এই দু'জনকে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। বাজ্‌জায, হাকেম

১৭. রসুলে আকদাস স. তাঁর প্রার্থনায় বললেন 'হে আমার প্রভুপালক! আবু বকরকে মহাবিচারের দিবসে জান্নাতে আমার মতোই মর্যাদা দান কোরো। হাকেম।

১৮. রসুলে আকদাস স. একদিন তাঁকে দেখে বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্‌ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ করেছেন। হাকেম।

১৯. একদিন তিনি স. বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্‌ তোমাকে উত্তম নেয়ামত দান করেছেন। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সে নেয়ামত কী রকম? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌ সর্বসাধারণের কাছে তাঁর মহিমা প্রকাশ করবেন সাধারণভাবে, আর তোমার কাছে প্রকাশ করবেন বিশেষভাবে। হাকেম।

২০. আর একদিন বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্‌ ও বিশ্বাসীগণ তোমার সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে না।

২১. একদিন একজনকে বললেন, আমাকে না পেলে আবু বকরের কাছে যেয়ো। বোখারী। আপনাকে না পেলে কার কাছে যাবো, এক মহিলার এরকম এক প্রশ্নের জবাব এভাবে দিয়েছিলেন তিনি স.

২২. আর একদিন বললেন, আমার কাছে এমন কিছু আসেনি, যা আমি আবু বকরকে দান করিনি।

২৩. একদিন হজরত ওমর হজরত আবু বকরকে বললেন— ১. আল্লাহ্‌র নবীগণের পরে মানুষের মধ্যে আপনিই সর্বোত্তম। ২. আর একদিন বললেন, আবু বকর আমাদের নেতা। আরও একদিন বললেন, পৃথিবীর সকল ইমানদারের বিশ্বাসের চেয়ে মহামান্য আবু বকরের বিশ্বাসের ওজন বেশী। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, মান্যবর আবু বকরের শরীর মেশকের চেয়েও অধিক সুরভিমণ্ডিত।

২৪. রোজা ও মোনাজাতের জন্য আবু বকর তোমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন নন। কেবল ওই উত্তম বিষয়টি ব্যতীত, যা তাঁর বুকে রাখা হয়েছে। রিয়াজুস সলিহীন।

২৫. হজরত আলী রা. বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমরা এমন কোনো সৎ কাজ করতে পারিনি, যে কাজে আবু বকর আমাদের চেয়ে অগ্রগামী না হয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ্‌র রসুলের পরে আবু বকর ও ওমর সর্বোত্তম। কেউ আমাকে ভালোবাসবে, অথচ আবু বকর ওমরকে ঘৃণা করবে— এরকম হতেই পারে না। তিবরানী। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, তিনি সর্বাধিক সাহসী ব্যক্তি। বাজ্‌জায।

২৬. আবু ইয়াহিয়া র. বলেছেন, হজরত আলী অসংখ্যবার মিম্বর থেকে এই উক্তিটি করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলের মুখ দিয়ে আবু বকরকে 'সিদ্দিক' উপাধিটি দিয়েছেন।

ছাব্বিশ

'মকতুবাত শরীফ' গ্রন্থের বহু স্থানে রসুলুল্লাহ স. এর সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদিন যে শ্রেষ্ঠ এবং হজরত আবু বকর যে শ্রেষ্ঠতম, সে কথার মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন এক স্থানে হজরত মোজাদ্দেদে

আলফেসানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী র. লিখেছেন, হামদ, সালাত ও দোয়ার পর সরলচিত্ত ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ আশরাফ— আপনি অবগত হন যে, কতিপয় দুষ্প্রাপ্য এলেম এবং বিস্ময়কর রহস্য ও আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের দান এবং শ্রেষ্ঠ মারেফাত, যার অধিকাংশই হজরত সিদ্দিকে আকবর, হজরত ওমর ফারুক, হজরত ওসমান জিন্নূরাইন এবং হজরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেগুলো সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করছি। মনোযোগের সঙ্গে শুনুন।

সিদ্দিকশ্রেষ্ঠ ও ফারুকশ্রেষ্ঠ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কামালতে মোহাম্মদী ও বেলায়েতে মোহাম্মদী (রসুলুল্লাহ স. এর নবুয়ত ও বেলায়েতের পূর্ণোৎকর্ষ) লাভ করা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে বেলায়েত বা নৈকট্যের দিক দিয়ে নবী ইব্রাহীমের সঙ্গে সম্পর্কিত। এবং দাওয়াত বা আহ্বানকার্য, যা নবুয়তসম্পর্কিত, সেক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত রসুল মুসার সঙ্গে। হজরত ওসমান উভয় দিকে সম্পর্ক রাখেন নবী নূহের সঙ্গে। আর হজরত আলী উভয়দিকে সম্পর্ক রাখেন রসুল ঈসার সঙ্গে। রসুল ঈসা ছিলেন রুহুল্লাহ ও কলেমাতুল্লাহ। তাঁর মধ্যে নবুয়তের কামালত অপেক্ষা বেলায়েতের কামালত প্রবল ছিলো। ওই সম্পর্কের কারণে হজরত আলীর মধ্যে বেলায়েতের দিকটিই অধিকতর প্রবল।

খলিফা চতুষ্টয়ের উৎপত্তির স্থান (মাবদায়ে তাইয়ুন) 'সেফাতুল এলেম' বা আল্লাহ্তায়ালার এলেম গুণ। ওই এলেম গুণই সংক্ষিপ্তি হিসাবে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রভুপালক (রব) এবং বিস্তৃতি হিসাবে রব হজরত ইব্রাহীম খলিলের, আর নবী নূহের রব উভয় দিকের সমতা এবং মধ্যাবস্থা অনুযায়ী। এভাবে রসুল মূসার রব 'সেফাতুল কালাম' রসুল ঈসার রব 'সেফাতুল কুদরত' নবী আদমের রব 'সেফাতে তকবীন' ইত্যাদি।

এবার মূল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হই। সিদ্দিকশ্রেষ্ঠ ও ফারুকশ্রেষ্ঠ (রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা) মর্যাদার তারতম্যানুসারে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর নবুয়তের দায়িত্ব বহনকারী এবং আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রসুল ঈসার সঙ্গে রূহানী সম্পৃক্ততার কারণে এবং বেলায়েতের প্রাবল্যের কারণে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বেলায়েতের দায়িত্ব বহনকারী। আর উভয় দিকের সমতার কারণে ওসমান জিন্নূরাইন রা. উভয়দিকের দায়িত্ব বহনকারী হয়েছেন। তাঁর জিন্নূরাইন (দুই নূরের

অধিকারী) নাম হয়তোবা একারণেই। সিদ্দিক ও ফারুক (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন নবুয়তের দায়িত্বভার বহন করেছেন, তখন তাঁরা হজরত মূসা আ. এর সঙ্গে অধিক সম্বন্ধ রাখেন। কারণ দাওয়াতের মাকাম, যা নবুয়তের মহিমা থেকে উৎপন্ন, তা আমাদের নবী স. ব্যতীত অন্য সকল নবীর চেয়ে মূসা নবীর মধ্যে অধিক ও পূর্ণরূপে আছে। কোরআন মজিদের পর তাঁর কিতাবই সর্বশ্রেষ্ঠ। একারণে পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে তাঁর উম্মতই অধিকহারে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অবশ্য নবী ইব্রাহীমের শরীয়ত ও ধর্ম অন্য সকল শরীয়ত অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ ও সমৃদ্ধ। তাই আমাদের নবী স. কে তাঁর শরীয়তের অনুসরণ করবার আদেশ দেওয়া হয়েছে এভাবে— 'তৎপর তোমার প্রতি এইমর্মে ওহী অবতীর্ণ করেছি যে, তুমি তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীমের ধর্মমতানুসারী হও।' সুরা হাজ।

হজরত মেহেদী আলায়হে রেদ্ধওয়ানেরও রব (প্রভুপালক) 'সেফাতুল এলেম।' তিনিও হজরত আলী রা. এর মতো হজরত ঈসার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিষয়টি যেনো এরকম— হজরত ঈসা আ. এর এক পা হজরত আলীর স্কন্ধে এবং অপর পা ইমাম মেহেদীর স্কন্ধে।

জানা আবশ্যক যে, হজরত মূসা আ. এর বেলায়েত অর্থাৎ 'লতিফায়ে সের' তাঁর বেলায়েতের (লতিফায়ে আখফার) বাম পাশে এবং হজরত ঈসা আ. এর বেলায়েত 'লতিফায়ে খফি' দক্ষিণ পাশে অবস্থিত।

হজরত আলী রা. বেলায়েতে মোহাম্মদীর দায়িত্বভার বহনকারী ছিলেন বলে নির্জনবাসী ওলীআল্লাহ্গণের অধিকাংশের সিলসিলা (আধ্যাত্মিক সূত্রপরম্পরা) তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। কামালিয়তে বেলায়েতবিশিষ্ট ওলীগণের উপরে তাই দেখা যায় সিদ্দিকে আকবর এবং ফারুকে আজমের (শায়েখাইনের) চেয়ে হজরত আলী রা. এর কামালিয়ত অধিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যদি শায়েখাইনের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আহলে সুন্নতওয়াল জামাতের ঐকমত্য (এজমা) না হতো, তাহলে নির্জনতাপ্রিয় ওলীগণের অধিকাংশের 'কাশফ' (আত্মিক উদ্ভাসন) হজরত আলীর শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশ প্রদান করতো।

শায়েখাইনের কামালিয়ত বা পূর্ণতা নবী রসুলগণের পূর্ণতাসমূহের অনুরূপ। বেলায়েতধারীগণের অঞ্চল তাঁদের কামালিয়তের অঞ্চল অপেক্ষা খর্ব এবং তাঁদের মহান মর্যাদার অতিমহিময়তার কারণে কাশফধারীগণের

কাশফ পথেই থেকে যায়। স্মর্তব্য, নবুয়তের কামালিয়তের তুলনায় বেলায়েতের কামালত পথে পড়ে থাকা বস্তুর মতো। প্রকৃতপক্ষে বেলায়েত নবুয়তে আরোহণের সিঁড়িস্বরূপ।

ভূমিকায় গর্ভান্তরের কতো আর সংবাদ দেওয়া যায়। প্রারম্ভিকতায় কি সংকুলান হতে পারে উপসংহারসংহিতার? নবীয়ে আখেরুজ্জামানের জামানা থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণে সাম্প্রতিককালের অনেকের কাছে আমার এমতো বক্তব্য বিশ্বাস করা কঠিনবোধ্য হতে পারে, কিন্তু কী আর করা যায়।

মুকুরের পিছে আমি তোতাপাখি যথা
যা বলিতে বলেন তিনি, বলি সেই কথা।

অবশ্য আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এই কারণে যে, আমি এ বিষয়ে আহলে সুন্নত জামাতের অনুকূল অভিমতধারী। তাঁদেরই ঐকমত্যানুসারী। দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলিই আল্লাহ্তায়ালা আমাকে কাশফ দ্বারা সত্যায়ন করিয়ে দিয়েছেন, সংক্ষিপ্তিকে করে দিয়েছেন সুবিস্তৃত। 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে উক্ত বিষয়ের প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি পথপ্রদর্শন না করলে আমরা পথপ্রাপ্ত হতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রভুপালকের রসুলগণ সত্যসহ প্রেরিত হয়েছেন।' সুরা আরাফ আয়াত ৪৩।

একদিন এক লোক বললেন, আলেমগণ লিখেছেন 'জান্নাতের দরজায় হজরত আলীর নাম লেখা আছে।' আমি ভাবতে লাগলাম, সেখানে শায়েখাইনের মর্যাদা হবে তা হলে কীরকম? পূর্ণমনোযোগী হবার পর আমার প্রতি এই অনিন্দ্যসুন্দর তথ্যটি প্রকাশ পেলো যে— এই উম্মতের জান্নাতগমন শায়েখাইনের অনুমোদনের উপরে নির্ভরশীল। বিষয়টি এরকম— হজরত আবু বকর জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং জনগণকে প্রবেশের অনুমতি দান করছেন, আর হজরত ওমর ফারুক তাদেরকে হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছেন। আরও দেখলাম, সমগ্র জান্নাত সিদ্দিকে আকবরের নূরে পরিপূর্ণ। এই ফকিরের চোখে শায়েখাইনের মর্যাদা অন্য সকল সাহাবীর তুলনায় পৃথক প্রকৃতির। যেনো কেউই তাঁদের সমকক্ষ নন। এবং সিদ্দিকে আকবর যেনো নবীয়ে আখেরুজ্জামানের সঙ্গে এক গৃহবাসী, যদি পার্থক্য থাকে তবে পার্থক্য মর্যাদার উচ্চতার ও নিম্নতার। ফারুকে আজমও সিদ্দীকে আকবরের তোফায়েলে উক্ত দৌলত লাভ

করেছেন। অন্য সকল সাহাবী তাঁর স. এর সঙ্গে এক শহরভুক্ত। তাঁদের সঙ্গে উম্মতের ওলীআল্লাহ্গণের কী আর তুলনা হতে পারে।

দূর হতে ঘন্টাধ্বনি পাইলে তাহার
তাহাই যথেষ্ট জানি, ভাগ্য সমাচার

অতএব উম্মতের ওলীগণ শায়েখাইনের কামালিয়ত কী আর উপলব্ধি করতে পারবেন। এই মহামান্য বুজর্গগণের মাহাত্ম্য ও মহিমা এতো অধিক যে, তাঁরা নবী-রসুলগণের মধ্যে গণ্য। এবং তাঁদেরই ফযীলত ও উৎকর্ষ দ্বারা সততপরিবেষ্টিত। রসুলে আকদাস স. বলেছেন, আমার পরে নবী হলে সে নবী হতো ওমর। ইমাম গায্যালী র. লিখেছেন, হজরত ওমর ফারুক রা. এর শোকসভাকালে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বললেন, আজ এলেমের দশ ভাগের নয় ভাগই অন্তর্হিত হলো। একথা বলার পর তিনি যখন অনেককে বিব্রতবোধ করতে দেখলেন, তখন বললেন, আমি বোঝাতে চেয়েছি আল্লাহ্পাকের যাতপাক সম্পর্কীয় এলেম, হায়েজ নেফাসের এলেম নয়।

সিদ্দীকে আকবরের ফযীলত সম্পর্কে কী আর বলবো, হজরত ওমরের সকল পুণ্য যে তাঁর এক পুণ্যের সমান— সত্যসংবাদবাহক রসুলুল্লাহ এরকমই বলেছেন। আমি আরও অনুভব করেছি যে, রসুলে আকরম স. থেকে হজরত আবু বকর যতোখানি নিম্নে হজরত আবু বকর থেকে হজরত ওমর আরও অধিক নিম্নে। এখন অনুভব করতে চেষ্টা করুন, অন্য সকল সাহাবী হজরত আবু বকর থেকে কতোখানি নিম্নে। পরলোকগমনের পরও তাঁরা রসুলসম্পৃক্ত। তাঁর পাশেই সমাহিত। রসুল স. এর সঙ্গেই সহপুনরুত্থান ঘটবে তাঁদের দু'জনের। অতএব সার্বক্ষণিক ও সর্বজাগতিক সান্নিধ্যধন্য হিসাবেই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। এই সম্বলহীন অধম তাঁদের কামালিয়তের বিষয়ে কী আর বলবে এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কী আর বিবরণ দিবে— পরমাণু সূর্যের কথা বলার ক্ষমতা কি রাখে? এক বিন্দু পানি কি মুখে আনতে পারে মহাসাগরের কথা? যে ওলীআল্লাহ্গণ খলকুল্লাহর (আল্লাহ্র সৃষ্টির) আহ্বানকার্যের জন্য প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণের আলেমগণ দ্বারা সত্য কাশফ ও সঠিক বুদ্ধিমত্তা এবং সত্য সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরাই শায়েখাইনের কামালিয়ত সম্পর্কে কিঞ্চিত উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁরা শায়েখাইনের

শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর উপর ঐকমত্যসম্পৃক্ত হয়েছেন। এর বিপরীত কাশফসমূহকে তাঁরা কর্তব্যজ্ঞান করেননি। এরকম হবেই বা না কেনো?

ইমাম বোখারীর বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা রসুলুল্লাহর জামানায় আবু বকরের সঙ্গে কারো তুলনা করতাম না। তৎপর ওমর, তৎপর ওসমানকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতাম। তৎপর সাহাবীগণকে নিষ্কৃতি দিতাম। কাউকে কারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিতাম না। ইমাম আবু দাউদের বিবরণে তাঁর এমতো বক্তব্যও এসেছে যে, আমরা রসুলুল্লাহ স. এর সময়ে বলতাম, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম জন মান্যবর আবু বকর, তারপর মান্যবর ওমর।

যারা বলে থাকেন, 'বেলায়েত নবুয়ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' তারা 'ছোকর' বা মত্ততাসম্পন্ন এবং তাঁরা ওই সকল ওলীগণের দলভুক্ত, যাঁরা নবুয়তের মাকামের উৎকর্ষ লাভ করেননি। আপনি হয়তো দেখে থাকবেন, এই ফকির তাঁর কোনো কোনো পুস্তিকায় একথাটি প্রমাণ করেছেন যে, নবুয়ত বেলায়েতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে বেলায়েত নবীর বেলায়েত হলেও। সত্য কথা এটাই।

আপনার জানা আছে যে, এই উচ্চ নক্শবন্দিয়া তরিকার ওলী আল্লাহ্গণের সকল সিলসিলা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সাথে সম্বন্ধিত। তাই 'ছহো' বা সজ্ঞা ও চৈতন্য এদের মধ্যে প্রবল এবং এদের আহ্বানকার্য (দাওয়াত) পূর্ণতর। সিদ্দিকে আকবরের কামালিয়ত এদের প্রতি অধিক প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এদের নেসবত (আত্মিক সম্বন্ধ) যাবতীয় সিলসিলার নেসবত থেকে উচ্চতর। অতএব, অন্যান্য সিলসিলার নেসবতধারীগণ এদের কামালিয়ত কী আর উপলব্ধি করতে পারবেন? এবং আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে এদের নৈকট্য যে কোন্ ধরনের, তার কী আর অনুভব করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু আমি একথা বলি না যে, নক্শবন্দি মাশায়েখগণ সকলেই এ বিষয়ে সমতুল্য। কিন্তু সহস্রের মধ্যে একজনও যদি উক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হন তবুও তো তা গণনীয় ও যথেষ্ট। আমি ধারণা করি, হজরত মেহেদী আলাইহে রেদ্বওয়ান যিনি পূর্ণ বেলায়েতধারী হবেন, তিনিও এই নকশবন্দিয়া নেসবতধারী হবেন এবং এই সিলসিলাকে আরও সমৃদ্ধ করবেন। মনে রাখতে হবে, সকল বেলায়েতের নেসবত এই উচ্চতম নেসবত অপেক্ষা নিম্নতর। এর কারণ এই যে, অন্য সকল বেলায়েত

কামালিয়তে নবুয়তের মর্তবার অতি সামান্য অংশপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এই বেলায়েত হজরত আবু বকর রা. এর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা হেতু উক্ত কামালিয়তের পূর্ণ অংশ লাভ করেছে।

উভয় পথের দিকে দ্যাখো মন দিয়া
কতো যে পার্থক্য আছে, দ্যাখো নিরখিয়া

হে ভ্রাতঃ! হজরত আলী বেলায়েতে মোহাম্মদী স. এর ভারোত্তলনকারী বলে কুতুব, আবদাল, আওতাদ, অর্থাৎ যাঁরা সংসারত্যাগী ওলী এবং যাঁদের মধ্যে কামালিয়তে বেলায়েত প্রবলতর, তাদের মাকামের তত্ত্বাবধান তাঁর (হজরত আলীর) সহায়তার প্রতি ন্যস্ত। 'কুতুবুল আকতাব' যাকে কুতুবে মাদারও বলা হয় অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কুতুবের মস্তক তাঁরই পদতলে। কুতুবে মাদার তাঁরই সাহায্যে সংকটাপন্ন কাজসমূহ সমাধা করেন এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হন। নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমাতুয্ যাহরা রা. এবং ইমাম হাসান-হোসেন ভ্রাতৃদ্বয় এই মাকামে হজরত আলী রা. এর সঙ্গে অংশপ্রাপ্ত।

জানবেন যে, নবী রসুলগণের সাহাবীগণ সকলেই মহান ও সম্মানার্হ। সকলকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। খতিব বাগদাদী হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকদাস স. বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা আমাকে মনোনীত করে নিয়েছেন এবং আমার জন্য মনোনীত করে দিয়েছেন আমার সহচরগণকে এবং তাদের মধ্যে পছন্দ করে দিয়েছেন শ্বশুর ও সাহায্যকারী। অতএব, যারা এদের বিষয়ে আমাকে রক্ষা করবে, আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং এদের বিষয়ে যারা আমাকে কষ্ট দিবে, আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে কষ্ট দিবেন।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকদাস স. আজ্ঞা করেছেন, যে লোক আমার সাহাবীগণের প্রতি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করবে, তার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার, ফেরেশতাবৃন্দের ও সকল মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকদাস স. বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে আমার সাহাবীগণের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে। মকতুব নং ২৫১, প্রথম খণ্ড।

সাতাশ

মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. এর মহাতিরোধানের পর তিনিই সাহাবীগণকে সান্ত্বনা দান করেছিলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন সংসারে-সমাজে-রাষ্ট্রে। এসকল কিছুই ছিলো তাঁর দায়িত্ব সম্পৃক্ত বিষয়। কিন্তু রসুলপ্রেমের যে আগুন বুকের মধ্যে সারাক্ষণ জ্বলে, জ্বলতেই থাকে, তাকে কি কোনো শান্তি-সান্ত্বনার কথা শোনানো যায়? 'আল্লাহ্ চিরঞ্জীব' 'আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে— এটাই মানুষের মূল দায়িত্ব' এ সব তো কতর্ব্যসচেতনতার কথা। এতে করে কি রসুলবিরহের আগুন প্রশমিত হয়? বক্ষাভ্যন্তরের যে গভীরে আগুন জ্বলতে থাকে, সেখানে তো কিছুতেই পৌঁছে না বোধ-অবোধের জ্ঞানের বারতা। প্রিয়জনের মিলনাকাঙ্ক্ষা ছাড়া সেখানে যে আর কিছুই নেই। সেখানে কেবল অপেক্ষার অসহায়তা, প্রিয়জনের বিরহঅনল। আকুতি— কবে হবে অবসান বিরহ দহনের।

হজরত আবু বকর কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে খেলাফতের গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করে চললেন কিন্তু তাঁর বক্ষাভ্যন্তর ক্রমাগত জ্বলে পুড়ে ক্ষয় হতে লাগলো রসুল বিরহের আগুনে। এভাবে কেটে গেলো দুই বৎসর তিন মাসের অধিক সময়। বক্ষাভ্যন্তরের অবক্ষয়াঘাত বাহিরে প্রকাশিত হলো। এভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালাই ব্যবস্থা করলেন তাঁর চিরসান্ত্বনার, মাশুক মিলনের।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুলুল্লাহর বিচ্ছেদ-বেদনা আবু বকর দীর্ঘদিন সহ্য করতে পারেননি। তিনি দিন দিন ক্ষীণকায় ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। তিনি সবাইকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে ছিলেন, কিন্তু অন্তর্বেদনাকে প্রশমিত করতে পারেননি।

একদিন তিনি এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসেছিলেন। দেখলেন, গাছের ডালে একটি পাখি নেচে বেড়াচ্ছে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হে বিহঙ্গ! কতো সুখী তুমি। বৃক্ষফল ভক্ষণ করো, আর তারই শাখায় নেচে খেলে বেড়াও। মৃত্যুর পরে তুমি যেখানে যাবে, সেখানে তোমাকে কিছুই জিজ্ঞেস

করা হবে না। হায়! আমি যদি পাখি হতাম। কখনো কখনো বলতেন, যদি ঘাস হতাম, তবে পশুখাদ্য হতে পারতাম। মুক্ত হতে পারতাম জবাবদিহিতার দায় থেকে।

ইমাম জুহুরী র. বর্ণনা করেছেন, আমিরুল মুমিনিন হজরত আবু বকর সিদ্দিকের কাছে হাদিয়ারূপে কিছু গোশত এসেছিলো। তিনি হারিস ইবনে কালদাকে নিয়ে খেতে বসলেন। হারিস বললেন, আমিরুল মুমিনিন! আপনি এ গোশত খাবেন না। এতে বিষ দেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাত গুটিয়ে নিলেন। সেদিন থেকে দু'জনেই কিছুটা শংকিতমনস্ক হয়ে পড়লেন। ১৩ হিজরীর ৭ই জমাদিউস সানি সোমবার তিনি গোসল করলেন। সেদিনই সর্দিজ্বর দেখা দিলো। জ্বর আর সারলো না। জ্বর নিয়েই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াতেন। শেষে মসজিদে যাওয়ার সামর্থ্য রইলো না। তখন হজরত ফারুককে ডেকে নামাজে ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন।

কোনো কোনো সাহাবী বললেন, আমরা চিকিৎসককে ডাকতে চাই। তিনি বললেন, চিকিৎসক আমাকে দেখেছেন। তাঁরা বললেন, তিনি কি কিছু বললেন? হজরত আবু বকর সিদ্দিক বললেন, 'ফায়ালুল্লি মা ইউরিদ' (আমি যা ইচ্ছা করি, তা-ই করি)।

তিনি যখন শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর মনে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের কথা মনে হলো। ভেবে ভেবে তিনি স্থির করলেন, বিজ্ঞ সাহাবীগণের পরামর্শক্রমে পরবর্তী খলিফার নাম প্রস্তাব করবেন। তিনি প্রথমে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফকে ডাকলেন। বললেন, ওমর সম্পর্কে আপনার মত কী? তিনি বললেন, আপনি তাঁর সম্পর্কে যতো ভালো মত পোষণ করেন, আমার কাছে তিনি তার চেয়েও ভালো। তবে একথাও ঠিক যে, তিনি কিছুটা কঠোর।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক বললেন, আমি কিছুটা কোমল প্রকৃতির বলেই তিনি কিছুটা কঠোর। দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে তিনি আপনা থেকেই উদার হয়ে উঠবেন।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ চলে গেলে তিনি ডাকলেন হজরত ওসমানকে। হজরত ওমর সম্পর্কে তাঁর মত জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আপনিই অধিকতর জ্ঞাত। হজরত আবু বকর বললেন, তবুও আপনারও একটা মত নিশ্চয়ই আছে। হজরত ওসমান

বললেন, আমি শুধু এতোটুকু বলবো যে, ওমরের অন্তর তাঁর বাহ্যিক আচরণের তুলনায় অধিকতর উত্তম। আমাদের মধ্যে তাঁর মতো আর কেউ নেই।

এরপর হজরত সাঈদ ইবনে যায়েদ এবং হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়েরের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন তিনি। হজরত উসায়েদ বললেন, ওমরের অন্তর পবিত্র। তিনি পুণ্যবানগণের বন্ধু এবং পাপিষ্ঠদের শত্রু। তাঁর চেয়ে সাহসী ও কর্মক্ষম কোনো ব্যক্তি আমার নজরে পড়ছে না।

আমিরুল মু'মিনিন এভাবে প্রধান প্রধান সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। সর্বত্র এই মর্মে প্রচার হয়ে গেলো যে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক পরবর্তী আমিরুল মু'মিনিন হিসেবে হজরত ওমরকে নিযুক্ত করতে চলেছেন। সংবাদ শুনে উপস্থিত হলেন হজরত তালহা রা.। তিনি বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! আপনার উপস্থিতিতেই ওমর মানুষের সঙ্গে কীরূপ কঠোরতা করেন, আপনি তো তা জানেন। তৎসত্ত্বেও এমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি সমীচীন হবে? খলিফা হলে তিনি না জানি কীরকম কাণ্ড শুরু করবেন। আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে চলে যাচ্ছেন। ভেবে দেখুন, কী জবাব দিবেন। বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক হজরত আবু বকর বললেন, আমি বলবো, হে আমার প্রভুপালক! আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলিফা নিযুক্ত করে এসেছি। পুনরায় তিনি বললেন, আমি যা বললাম, ওমর তার চেয়েও উত্তম।

পরামর্শবিনিময়পর্ব শেষ হলো। তিনি হজরত ওসমানকে ডেকে এনে বললেন, খেলাফতের অসিয়তনামা লিখুন। হজরত ওসমান লিখতে শুরু করলেন। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি লেখা হওয়ার পর তিনি সজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। হজরত ওসমান নিজে থেকেই লিখে দিলেন, আমি ওমর ইবনে খাত্তাবকে খলিফা নিযুক্ত করলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি সজ্ঞা ফিরে পেলেন। বললেন, কী লিখেছেন, পড়ে শোনান।

হজরত ওসমান পড়তে শুরু করলেন— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এটা আবু কোহাফার পুত্র আবু বকরের অসিয়তনামা, যা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়েছেন তাঁর অন্তিম যাত্রার প্রাক্কালে। এটা এমন একটি সময়ের অসিয়ত, যখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী হতে চায়, পাপিষ্ঠরা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে এবং সত্যের সম্মুখে মস্তক অবনত করে দেয় মিথ্যা। হে

জনতা! আমি খাত্তাবের পুত্র ওমরকে তোমাদের জন্য খলিফা নিযুক্ত করলাম। তোমরা তাঁকে মান্য করে চলবে। আমি এই নির্বাচনে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং ইসলামের ও মুসলমানদের প্রতি আমার দায়িত্বের কথা স্মরণে রেখেছি। এ ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণ শৈথিল্য প্রদর্শন করিনি। এরপর ওমর যদি ন্যায়বিচার করেন, তবে তা হবে আমার ধারণা ও অভিজ্ঞতার অনুকূল। আর যদি তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন, তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, প্রত্যেককে তাঁর কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আমি যা কিছু করলাম, তা সদুদ্দেশ্যেই করলাম। ভবিষ্যতের সংবাদ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। যে অত্যাচার করবে, অতিসত্বর সে তার পরিণাম ভোগ করবে। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

খলিফা বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর! তারপর হজরত ওসমানকে বললেন, জনতার সামনে যাও। তিনি নিজেও উঠে দাঁড়ালেন। অনেক কষ্টে বারান্দায় গেলেন। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিলো। তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণী হজরত আসমা তাঁকে ধরে রাখলেন। সেখানে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে মহামান্য খলিফা বললেন, হে জনমণ্ডলী! আমি তোমাদের জন্য একজনকে খলিফা মনোনীত করেছি। তোমরা কি রাজি আছো? সকলে সমস্বরে বললো, হে আল্লাহ্র রসুলের খলিফা! আমরা সম্পূর্ণরূপে রাজি আছি। সম্মুখসারিতে দাঁড়ানো হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বললেন, তিনি যদি ওমর হন তবু আমরা রাজি আছি। খলিফা বললেন, হ্যাঁ, তিনি ওমরই। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে ভেবে দেখেছি। তাছাড়া আমি আমার কোনো প্রিয়জন-নিকটজন-আত্মীয়স্বজনের নাম প্রস্তাব করিনি। আমি আমার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছি খাত্তাবতনয় ওমরকে। আপনারা তাঁকে কবুল করে নিন।

সভা ভঙ্গ হলো। বিষণ্ন ও আনন্দিত জনতা গৃহে ফিরে গেলো। খলিফা হজরত ওমরকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। শয্যাশায়ী অবস্থায় কিছু সদুপদেশ প্রদান করলেন। দুই হাত তুলে দোয়া করলেন। হে আমার পরম প্রভুপালক! আমি মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই এমন করলাম। আমি তাদের মধ্যে বিদ্বেষ-কলহের আশংকা করেছিলাম। হে আমার আল্লাহ্! তুমি জানো, আমার এমতোসিদ্ধান্ত আমার গভীর ভাবনার ফসল। আমার

বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা দৃঢ়চেতা এবং মুসলমানদের সবচেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেছি। তোমারই হুকুমে এ নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করে যাচ্ছি। তোমার বান্দাদের ভার মূলতঃ তোমারই হাতে। তারা তোমারই দাস। তুমিই তাদের নিয়ন্ত্রয়িতা। তুমি মুসলমানদেরকে পুণ্যবান শাসক দিয়ো। ওমরকে খোলাফায়ে রাশেদীনের শ্রেণীভুক্ত কোরো। তাঁর প্রজাবৃন্দকে সুনাগরিক করে দিয়ো।

রোগযন্ত্রণা প্রতিদিনই বেড়ে যেতে লাগলো। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা গাবা নামক বাগানের বিশ ওসাক খোরমা আমার নামে হেবা করে দিয়েছিলেন। শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি আমাকে ডেকে বললেন, মা মনি! আমি তোমাকে সর্বাবস্থায় প্রফুল্লচিত্ত দেখতে চাই। তুমি দুঃখ পেলে আমিও দুঃখ পাই। আর তোমার শান্তিতে পাই শান্তি। গাবার কিছু খেজুর তোমাকে হেবা করে দিলাম। যদি তুমি ওগুলো নিয়ে থাকো, তবে তো ভালোই হয়েছে। আর যদি না নিয়ে থাকো, তবে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর ওগুলো পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পরিণত হবে। তোমার আরও দু'জন ভাই-বোন আছে। কোরআনের বিধান অনুসারে ওগুলো তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ো। আমি বললাম, আব্বুজি! আপনার নির্দেশ আমি অবশ্যই পালন করবো। এর চেয়েও বেশী সম্পত্তি যদি থাকতো, তবুও আমি আপনার নির্দেশ পালন করতাম।

মহামান্য খলিফা বললেন, আমি বায়তুল মাল থেকে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করেছি, তার হিসাব উপস্থিত করা হোক। হিসাব করা হলো। দেখা গেলো, ভাতা হিসাবে এ যাবত তিনি গ্রহণ করেছেন সর্বমোট ছয় হাজার দিরহাম। তিনি নির্দেশ দিলেন, আমার জমিন বিক্রি করে এই অর্থ বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তখনই জমিন বিক্রয় করা হলো। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে তখনই পরিশোধ করা হলো গৃহিত অর্থ। মহামান্য খলিফা হলেন সর্বপ্রকার ঋণ থেকে মুক্ত।

এরপর বললেন, এবার দ্যাখো, খলিফা হওয়ার পর আমার অন্যান্য সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা। দেখা গেলো, বৃদ্ধি পেয়েছে একজন ক্রীতদাস। তিনি ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখা শোনা করেন। কখনো কখনো মুসলিম সৈন্যদের তরবারী শান দেওয়ার কাজ করেন। আর বেড়েছে একটি উট। উটটিকে দিয়ে পানিবহনের কাজ করা হয়। আরও দেখা গেলো একটি

বাড়তি চাদর। চাদরটির মূল্য এক টাকা অথবা সোয়া টাকা। মহামান্য খলিফা বললেন, আমার পরলোকগমনের পর এগুলো যেনো পরবর্তী খলিফার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

শেষ দিন সমুপস্থিত হলো। ইরাক অঞ্চলের সহকারী সেনাপতি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর আগমনবার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মহামান্য খলিফা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন। জানলেন, পারস্য সম্রাট কিস্‌রা ইরাক সীমান্তে নতুন করে সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়েছে। তৎক্ষণাৎ হজরত ওমরকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, ওমর! আমি যা বলছি, তা শোনো। নির্দেশানুক্রমে কাজ করো। মনে হয় আজই আমি চলে যাবো। যদি দিনের মধ্যে যাই, তবে সন্ধ্যার আগে, আর যদি রাতে যাই, তবে প্রত্যুষের পূর্বেই মুসান্নার সাথে একটি বাহিনী প্রেরণ কোরো। পুনরায় বললেন, ওমর! যে কোনো মুসিবত আসুক না কেনো, ইসলামের খেদমত এবং আল্লাহ্‌র হুকুম পালনকে আগামী দিনের জন্য জমা রেখো না। রসুলুল্লাহ স. এর মহাপ্রয়ানের চেয়ে আমাদের জন্য বড় বিপদ আর কী হতে পারে? সেই দিনও দেখেছো, আমার যথাকর্তব্য আমি পালন করেছি। যদি সেদিন আমি কর্তব্য পালনে শিথিলতা করতাম, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। মদীনার ঘরে ঘরে প্রজ্জ্বলিত হতো কলহ-বিবাদের অনির্বাণ আগুন। আরো শোনো, আল্লাহ্‌তায়ালা যদি মুসলিমবাহিনীকে সিরিয়ায় জয়যুক্ত করান, তবে খালেদের বাহিনীকে ইরাক সীমান্তে প্রেরণ কোরো। কারণ সে বহুদর্শী এবং ইরাক সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

সময় সন্নিকটবর্তী হলো। মহামান্য খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, রসুলুল্লাহ কোন্ দিন বিদায় নিয়েছিলেন? উপস্থিত জনেরা জবাব দিলেন, সোমবার। খলিফা বললেন, আমিও আজই বিদায় নিতে চাই। আমাকে যেনো রসুলুল্লাহর কদমের কাছে কবর দেওয়া হয়।

পাশে বসে ছিলেন রোদনবিধুরা উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, রসুলুল্লাহকে কয়খানা কাপড়ে দাফন করা হয়েছিলো? জননী আয়েশা সিদ্দিকা বললেন, তিনখানা কাপড়ে। খলিফা বললেন, আমাকেও যেনো তিনখানা কাপড়েই দাফন করা হয়। যে দুইখানা শরীরে আছে, সে দুটো ধুয়ে নিয়ো, আর একখানা তৈরী করে নিয়ো।

জননী আয়েশা সিদ্দিকা রা. বললেন, আব্বুজি! আমরা তো অতোটা দরিদ্র নই যে, নতুন বস্ত্র ক্রয় করতে পারবো না । তিনি বললেন, মা মনি! নতুন বস্ত্র জীবিতদের জন্য প্রয়োজন। আমার জন্য ছিন্ন-পুরাতন বস্ত্রই যথেষ্ট।

সিদ্দিকসূর্য সায়াহ্নাভিসারী হলো। আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলো অস্তাচলকে। জননী আয়েশা পিতৃবিয়োগের বেদনায় শোকাকুলা। তাঁর দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর নদী। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর পবিত্র ওষ্ঠাধর থেকে উচ্চারিত হলো কবিতার দু'টি পঙ্‌ক্তি—

কী সুন্দর তার রূপ, মেঘমালাও যার নিকট বারি যাচঞাকারী
তিনি পিতৃহীন অনাথদের আশ্রয়, পতিহীনাদের নিবেদন শ্রবণকারী।

মহামান্য খলিফা চোখ মেলে তাকালেন। রোগক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, মা মণি! এ কবিতা তো রসুলুল্লাহর জন্য শোভন।

জননী মহোদয়া আর একটি কবিতা পাঠ করলেন—

তোমার জীবনের শপথ! মৃত্যুকষ্ট যখন আগমন করে
তখন অর্থ-বিত্ত, প্রতাপ-প্রতিপত্তি কোনো কাজেই লাগে না।

মহামান্য খলিফা বললেন, না, মা মণি! এভাবে নয়, বলো এভাবে, যেভাবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন 'ওয়া জায়াত্ সাক্‌রাতুল মাউতি বিল হাক্ক, জালিকা মা কুন্‌তা মিনহু তাহীদ' (যে মৃত্যু থেকে তোমরা সতত পলায়োনোদ্যত, সে মৃত্যুযন্ত্রণা এখন সত্যিই সমুপস্থিত)।

জননী মহোদয়া আবারও আবৃত্তি করলেন—

যে অশ্রুধারা রুদ্ধ হয়েছে, তা একদিন প্রবাহিত হবে
প্রত্যেক পথিকের একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল থাকে
এবং প্রত্যেক পরিধানকারীই পায় বস্ত্র-সান্ত্বনা

মহামান্য খলিফা অতি ধীরে বললেন, না কন্যা না। ওরকম করে নয়, বলো সেভাবে, যেভাবে মহাপ্রভুপালক আল্লাহ্ বলেছেন— যে মৃত্যুর জন্য তোমরা সততশংকিত, সেই মৃত্যু কষ্ট এখন সত্যিই নিকটবর্তী।

মহামান্য খলিফা শেষবাক্য উচ্চারণ করলেন এভাবে— 'রব্বি তাওয়াফ্‌ফানি মুসলিমাওঁ ওয়াল্ হিক্কনি বিস্ সলিহীন' (হে আমার প্রভুপালক! আমাকে মুসলমান হিসাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দাও এবং সঙ্গী করে দাও তোমার সৎবান্দাদের)।

হিজরী ১৩ সাল। ২২ জমাদিউস্ সানি। সোমবার। মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি পরমতম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর মহাপুণ্যবতী স্ত্রী তাঁকে গোসল করালেন। পুণ্যবান পুত্র হজরত আবদুর রহমান পবিত্র শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। জানাযার নামাজ পড়ালেন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব। রসুলুল্লাহ স. এর পবিত্র সমাধির পাশে তাঁর কদম বরাবর কবর খনন করা হলো। হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত তালহা এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রসুলের গুহার সাথীকে কবরে স্থাপন করলেন।

আটাশ

মহামান্য খলিফার মহাতিরোধানের সংবাদ পেয়ে হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু পাঠ করলেন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন' (নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ্রই প্রতি প্রত্যাবর্তন আমাদের সকলের)। সদ্যপ্রয়াত খলিফার গৃহের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, আজ মহানবী স. এর খেলাফতের অবসান ঘটলো। তারপর তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন—

হে আবু বকর! আপনার উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। আপনি শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবীর প্রিয় সঙ্গী, তাঁর বন্ধু এবং তাঁর আনন্দের উৎস ছিলেন, ছিলেন তাঁর গোপন রহস্যের ভাণ্ডার, ছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা। আপনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, আপনার বিশ্বাস পবিত্র ও সুদৃঢ়। সবার চেয়ে আপনি আল্লাহ্কে অধিক ভয় করতেন। আল্লাহ্র ধর্মের বিভিন্ন সুবিধাদির সূত্র ছিলেন আপনি। আপনি আল্লাহ্র রসুলের সঙ্গে সর্বাধিক সময় যাপন করেছেন। ইসলামের প্রতি আপনার আকর্ষণ ছিলো সকলের চেয়ে বেশী। সাহাবীদের প্রতি নেয়ামতস্বরূপ আপনিই ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম। অনেক গুণে গুণান্বিত, সাফল্যের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগামী, সর্বোচ্চ সম্মানাসীন, মূল-উৎসঘনিষ্ঠ। চরিত্র মাধুর্য, আচরণ, দয়া-মায়ার দিক থেকে অন্যান্যদের চেয়ে রসুলুল্লাহ স. এর সঙ্গে ছিলেন অধিকতর সাদৃশ্যযুক্ত। ছিলেন তাঁর

সর্বাধিক আস্থাভাজন। আপনার অবস্থানস্থল উচ্চ, মর্যাদা মহান। ইসলাম ও ইসলামের নবীর পক্ষ থেকে আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন।

আল্লাহ্র রসুল স. এর জন্য আপনি ছিলেন দৃষ্টি ও শ্রুতি। সবাই যখন অবিশ্বাস করেছিলো, আপনি তখন প্রত্যাদেশিত বাণীসমূহের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। সে কারণেই তো আল্লাহ্ আপানাকে 'সিদ্দিক' উপাধি দান করেছেন। এরশাদ করেছেন, যিনি সত্য এনেছেন এবং সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সত্যসহ এসেছেন, তিনি হলেন মোহাম্মদ এবং সত্যের বিষয়ে যিনি সাক্ষ্যদান করেছেন, তিনি হলেন আবু বকর।

যখন সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলো, তখন আপনি তাঁকে সমর্থন করেছেন এবং বিপদ-মুসিবতের দিনগুলোতে যখন অনেকেই তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলো, তখনও আপনি ছিলেন তাঁর সুদৃঢ় সমর্থক। দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ছিলেন সার্বক্ষণিক সহচর। আপনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয় জন এবং গিরিগুহায় তাঁর সঙ্গী। আল্লাহ্ আপনাকে তখন শান্তি দিয়েছিলেন। আপনি হিজরতের সময়েও ছিলেন তাঁর পবিত্র সংসর্গধন্য। আপনিই ছিলেন তাঁর খলিফা। ধর্মদ্রোহিতা বিস্তার লাভ করলে আপনি এমন দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র বিধানাবলীর অনুসরণ করেছিলেন যে, ইতোপূর্বে কোনো নবীর খলিফা তেমন পারেননি। আপনি প্রয়োজনানুসারে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। অন্যদের চাঞ্চল্য ও দুর্বলতার সময় আপনি দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন।

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, মুনাফিক ও ধর্মদ্রোহীদেরকে নিরাশ করে দিয়ে আপনি মহানবী স. এর খলিফা হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপনি ওই সময়েও আল্লাহ্র নূরে অবগাহন করেছেন, যখন অন্যান্যরা হয়েছিলো পশ্চাদবর্তী। সবাই আপনাকে অনুসরণ করে পথের দিশা পেয়েছে। নিম্নকণ্ঠ ছিলেন আপনি, কিন্তু ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী। আপনার কথা-নিরবতা অনুসরণযোগ্য, যুক্তি যথার্থ, দীর্ঘ নিরবতাও সৌন্দর্যমণ্ডিত। আর আপনার বক্তব্য-বক্তৃতা উদ্দীপনাময়। আপনি সাহসী, জ্ঞানী ও মহিমময়।

আল্লাহ্র শপথ! আপনি বিশ্বাসীদের অধিনায়ক ছিলেন। বিশ্বাসীদের প্রতি আপনি পিতৃস্নেহ বর্ষণ করেছেন। তাদের ব্যর্থতাকে আপনি সাফল্য

দ্বারা আবৃত করেছেন। তারা যা পরিত্যাগ করেছে, আপনি তা সম্পাদন করেছেন। তারা যা ধ্বংস করতে চেয়েছে, আপনি তা রক্ষা করেছেন। তারা যা জানতো না আপনি তা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাদের অসহায়তার সময় আপনি ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন। আর তাদের অধৈর্যের সময় প্রদর্শন করেছেন সহিষ্ণুতা। যারা ন্যায়বিচারপ্রার্থী হয়েছে, আপনি তাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। ফলে সকলে আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করে অচিন্ত্যনীয় সফলতার সম্মুখীন হয়েছে।

ধর্মদ্রোহীদের জন্য আপনি ছিলেন ভয়াবহ শাস্তিদাতা। আর বিশ্বাসীদের জন্য ছিলেন স্নেহ, দয়া ও নিরাপত্তাপ্রদানকারী। আপনি বিনয়বিশ্বে পরিভ্রমণ করেছেন এবং বিনয়ের সৌন্দর্য ও মহত্বে ভূষিত হয়ে হয়েছেন মর্যাদার উচ্চশিখরাধিকারী। আপনার যুক্তি ও অভিমত দুর্বলতাদুষ্ট ছিলো না। কাপুরুষতা ও কাপট্য আপনাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। আপনার হৃদয় ছিলো সতত ভ্রান্তিবিমুক্ত। ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রতিকূলে আপনি ছিলেন পর্বতের মতো অটল। মহানবী স. নিজেই বলেছেন, আপনি বন্ধুত্ব ও সম্পদ বিতরণে সর্বাধিক উদার। তিনি আরও বলেছেন, শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হলেও আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনের ক্ষেত্রে আপনি ছিলেন শক্তিমান। আচরণে আপনি বিনম্র হলেও আল্লাহ্‌র নিকটে উচ্চসম্মানের অধিকারী। সকলেই আপনাকে শ্রদ্ধা করতো, ভালোবাসতো। কেউ আপনার প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। আপনি নির্লোভ ছিলেন। ছিলেন অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দুর্বলদের সহচর। শক্তির অহমিকা প্রদর্শনকারীরা আপনার সামনে দুর্বল হয়ে যেতো, অপরের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে নতি স্বীকার করতো। এ ব্যাপারে নিকট-দূর সকলের ক্ষেত্রে আপনি ছিলেন পক্ষপাতবিমুক্ত। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করতো ও তাঁর আদেশসমূহ পালন করতো, তাঁরাই ছিলেন আপনার আপনজন। সত্যবাদিতা, যথার্থতা ও ঔদার্য- মহত্ব— আপনি ছিলেন এসকল কিছুর প্রতিভূ। আপনার কথা ছিলো সুস্পষ্ট, নির্দেশ ছিলো নম্র-কঠিন ও সতর্কতাসমৃদ্ধ। আর আপনার মতামতে ছিলো দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞা। এভাবে আপনি অসত্যকে পরাভূত করেছেন, সমস্যাসমূহের আপনোদন ঘটিয়েছেন, নির্বাপিত করেছেন দ্রোহাগ্নি। আপনি ধর্মে মধ্যপন্থা, বিশ্বাসে শক্তি ও ইসলামে দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ্‌র বিধানাবলীকে দিয়েছেন বিজয়ের মহিমা। আপনার

কারণেই ধর্মদ্রোহিতা পেয়েছিলো অঙ্কুরসমাধি। আপনার কর্মদক্ষতা ও কর্মসম্পাদনক্ষমতা ছিলো অসাধারণ। আপনি কখনোই হতোদ্যম হননি। আপনার তিরোধানে বেহেশতবাসীরা শোকাভিভূত। আপনার মহাপ্রয়ানে মানুষের মূলশক্তি অশক্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা তাই এই পবিত্র প্রত্যাদেশবাক্যটি উচ্চারণ করে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস পাচ্ছি— নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন আমাদের সকলের।

যা হোক, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন এবং করেছেন, আমরা তা স্বীকার করে নিচ্ছি। আমরা তাঁর নির্দেশাবলী মেনে নিতে সতত প্রস্তুত। আল্লাহ্‌র শপথ! মহানবী স. এর মহাপ্রস্থানের পরে মুসলমানদের জন্য এতো কঠিন বিপদ আর আসেনি। ধর্মের জন্য আপনি ছিলেন শক্তি, মহিমা ও নিরাপত্তার উৎস। বিশ্বাসীদের জন্য আপনি ছিলেন সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল ও দুর্গ। আর কপটচারীদের জন্য ছিলেন কঠোর ও ভীতিপ্রদ। এসবের পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্ যেনো আপনাকে মহানবী স. এর একান্ত সন্নিধানে নিয়ে যান, আপনার প্রচেষ্টা ও শ্রমের ফলাফল থেকে যেনো আমাদেরকে বঞ্চিত না করেন। আপনার পরে আমরা যেনো বিপথগামিতাকে আমন্ত্রণ না জানাই। আমরা পুনরায় আবৃত্তি করছি— নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র, আর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে আমাদেরকে।

জনতার অবিরাম অশ্রুপাত ও রোদনধ্বনির মধ্যে হজরত আলী তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। বক্তৃতা শেষে জনতার জবাব এলো এভাবে— হে রসুলুল্লাহর জামাতা! আপনি সত্য কথা বলেছেন।

ওদিকে নতুন খলিফা হজরত ওমরের কাছে পাঠানো হলো রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার্য প্রাক্তন খলিফার সম্পদ— একজন ক্রীতদাস, একটি উট এবং একটি পুরাতন চাদর। তিনি কেঁদে ফেললেন। বললেন, মহামাননীয় খলিফাতুর রসুল! আপনি আপনার স্থলবর্তীদের দায়িত্ব কঠিন করে রেখে গেলেন।

ঊনতিরিশ

এরপর শত শত বৎসর গত হয়ে গেছে। কিন্তু সিদ্দিকশ্রেষ্ঠ হজরত আবু বকরের মহিমা-মহত্বের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা কখনো থামেনি। কমেওনি। রসুলুল্লাহ স. নিজে তাঁর প্রশস্তি বর্ণনা করেছেন। আর সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী এবং আলেম-আউলিয়াগণ কতোভাবে যে তাঁর মহিমাবিশ্লেষণ করেছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রথম তার তালিকাও তৈরী করেছেন কেউ কেউ। যেমন বলা হয়েছে— ১. পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন ২. তিনিই প্রথম গ্রন্থিত কোরআনকে 'মাসহাফ' নামে অভিহিত করেছেন ৩. মহানবী স. এর পরে তিনিই প্রথম কোরআনের আয়াতসমূহকে একত্র করেন। এসম্পর্কে হজরত আলী রা. মন্তব্য করেছেন, মান্যবর আবু বকরের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। তিনিই প্রথম কোরআনুল করিমের আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে গ্রন্থরূপ দিয়েছেন, যা উম্মত কর্তৃক ঐকমত্যরূপে গৃহীত হয়েছে ৪. মহানবী স. এর সঙ্গে তিনিই প্রথম অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। অতএব তিনিই প্রথম মুজাহিদ ৫. খলিফাগণের মধ্যে তিনিই প্রথম ৬. খেলাফত গ্রহণকালে একমাত্র তাঁর পিতাই জীবিত ছিলেন ৭. একমাত্র তিনিই পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেছিলেন ৮. তিনিই প্রথম বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন ৯. পবিত্র ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ১০. সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই প্রথম ইজতিহাদের প্রচলন করেন ১১. তিনিই প্রথম খলিফা হিসেবে অভিহিত হন ১২. ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সিদ্দিক ও আতিক উপাধি পান ১৩. মহানবী স. এর অনুসারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন ১৪. ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মসজিদ নির্মাণকারী ১৫. তাঁর চার পুরুষ পর্যন্ত মহানবী স. এর সঙ্গী ছিলেন— তিনি নিজে, তাঁর পিতা আবু কোহাফা, পুত্র আবদুর রহমান এবং পৌত্র আবু আতিক মোহাম্মদ। এমতো অনন্যসাধারণ মর্যাদার ক্ষেত্রেও তিনিই প্রথম।

তাসাউফের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম কলেমার জিকির করার পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। 'কাশফুল মাহফুজ' রচয়িতা তাঁকে তাসাউফের আমির বলেছেন। ইমাম জাফর সাদেক র. এর মাধ্যমে নক্শবন্দিয়া তরিকা তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। স্বনামধন্য সূফীগণ মনে করেন, হজরত আবু বকরের নেসবত (রূহানী সম্বন্ধ) নবী ইব্রাহীম খলিল আ. পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তাই তাঁর বক্ষাভ্যন্তরে তওহীদের ধ্যান-ধারণা এতো গভীর। পবিত্র কোরআনে হজরত ইব্রাহীমকে বলা হয়েছে 'আউয়াহান' (ধৈর্যশীল) এবং 'মুনিব' (আল্লাহ্মুখী)। এই গুণ দু'টি হজরত আবু বকরের উপরেও ছিলো সতত প্রভাবময়। তিনি ছিলেন রসুলুল্লাহ স. এর পূর্ণপ্রতিবিম্ব (জিমনি)। তাই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেতো রসুলুল্লাহ স. এর সমূহ বৈশিষ্ট্যাবলী। শাহ ওয়ালিউল্লাহ র. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার মহিমা-মহত্বের প্রভাবে তাঁর হৃদয়ে সতত প্রোজ্জ্বল থাকতো অলৌকিক নূর। তাই সত্য তাঁর কাছে শুধু ধারণা না হয়ে ধরা দিতো নিশ্চিত বিশ্বাসরূপে। মহানবী স. এর এই হাদিসখানিতে সে কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়— যেমন তিনি স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমার হৃদয়ে যা দিয়েছেন, আমি আবু বকরের হৃদয়ে তা-ই দিয়েছি।

রসুলুল্লাহ যদি ধ্বনি হন, তবে তিনি তাঁর প্রতিধ্বনি। যদি তিনি স. বৃক্ষ হন, তাহলে 'সিদ্দিকশ্রেষ্ঠ' হন বৃক্ষচ্ছায়া। যেনো তাঁরা দু'জনে একই নির্ঝরিণীর জল ও জলস্রোত, একই বিশ্বাসের রণন এবং অনুরণন, অথবা একই ভাবনা-ভালোবাসার ধারা ও ধারাবাহিকতা।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ ১. তাফসীরে মাযহারী ২. বোখারী শরীফ ৩. তিরমিজি শরীফ ৪. মেশকাত শরীফ ৫. কাতেবীনে ওহী ৬. আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ ৭. খোলাফায়ে আরবাআহ্ ৮. বিশ্বনবী ৯. সাইয়্যেদুল মুরসালিন ১০. মাদারেজুন্ নবুওয়াত ১১. মকতুবাত শরীফ ১২. মুকাশিফাতে আয়নিয়া ১৩. মাআরিফে লাদুন্নিয়া ১৪. হালাতে মাশায়েখে নক্‌শবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া ১৫. তারিখুল খুলাফা ১৬. সাহাবা চরিত ১৭. সিরাতুস্ সিদ্দিক ১৮. হজরত আবু বকর ১৯. সিদ্দিকে আকবর হজরত আবু বকর ২০. ইনসানিয়াত মওত কে দরওয়াজে পর ২১. জননীদের জীবনকথা ২২. সীরাতুন নবী স. ২৩. সীরাতে ইবনে হিশাম।

SIDDIKSRESTHA

Written by Mohammad Mamunur Rashid
Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia
www.hakimabad.com
Exchange Taka 100.00/- only. US $ 10

ISBN : 984-70240-0069-9